জগদানন্দ রায়

জন্ম ৩ আশ্বিন ১২৭৬ ॥ ১৮ সেপ্টেম্বর ১৮৬৯

মৃত্যু ১১ আষাঢ় ১৩৪০ ॥ ২৫ জুন ১৯৩৩

শান্তিনিকেতন পুস্তক-প্রকাশ-সমিতি
শান্তিনিকেতন

জগদানন্দ রায়

तमसो मा ज्योतिर्गमय

VISVA BHARATI
LIBRARY
SANTINIKETAN

082.8:92(04)

J181

শান্তিনিকেতন পুস্তক-প্রকাশ-সমিতি প্রকাশিত

তনয়েন্দ্রনাথ ঘোষ ॥

ত্রিশ বৎসরের উর্ধ্বকাল তনয়েন্দ্রনাথ অধ্যাপকরূপে শান্তিনিকেতনের সেবা করেছিলেন। এই পুস্তকে তাঁর ছাত্রছাত্রী ও সহকর্মীদের লিখিত স্মৃতিকথা সংকলিত হয়েছে। মূল্য ২.০০

আমাদের লেখা ॥

শান্তিনিকেতন-পাঠভবনের ছাত্রছাত্রীদের রচিত গল্প প্রবন্ধ কবিতা ছবির বার্ষিক সংগ্রহ। বাইশ খণ্ড প্রকাশিত হয়েছে। প্রতি খণ্ড মূল্য ১.০০, ১.৫০

জগদানন্দ রায়

শিল্পী নন্দলাল বসু

জগদানন্দ রায় মহাশয়ের জন্মশতবর্ষপূর্তি উপলক্ষ্যে সংকলিত
প্রকাশ ৭ পৌষ ১৩৭৬

সূচী

স্মরণ

১ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

২ শ্রীপ্রমথনাথ বিশী

৩ শ্রীহীরেন্দ্রনাথ দত্ত

৪ শ্রীনিরঞ্জন সরকার

৫ শ্রীঅলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত

স্মৃতি · জগদানন্দ রায়

পঞ্জী

জগদানন্দ রায়ের গ্রন্থসূচী শ্রীপার্থ বসু

জগদানন্দ রায় সম্বন্ধে রচনাসূচী শ্রীঅনাথনাথ দাস

চিত্রসূচী

জগদানন্দ রায়

শ্রীপ্রভাতমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়-গঠিত মূর্তি। প্রচ্ছদ

জগদানন্দ রায়

শিল্পী আচার্য নন্দলাল বসু

জগদানন্দ রায় ১৩৩০

শ্রীহিমাংশুলাল সরকার গৃহীত চিত্র

জগদানন্দ রায়ের ক্লাস

জগদানন্দের পাণ্ডুলিপি

জগদানন্দ রায় শান্তিনিকেতন বিদ্যালয়ের প্রথম বর্ষে শিক্ষকরূপে যোগ দিয়ে এই প্রতিষ্ঠানের বিচিত্র কর্মধারার সঙ্গে জীবনের শেষভাগ পর্যন্ত নিবিষ্টভাবে যুক্ত ছিলেন। ১৩৭৬ সালের ৩ আশ্বিন তাঁর জন্মের পর শতবর্ষ পূর্ণ হয়েছে। এই উপলক্ষে বিশ্বভারতী পাঠভবন ঐ দিবসে একটি স্মরণসভার আয়োজন করেন। শান্তিনিকেতনের ছাত্রছাত্রীদের কাছে জগদানন্দের পুণ্যচরিত ও কীর্তি প্রকাশমান রাখবার উদ্দেশ্যে শান্তিনিকেতন পুস্তক-প্রকাশ-সমিতি একখানি পুস্তিকা প্রকাশেরও সংকল্প করেন, সেই উদ্যোগের ফল এই সংকলন।

বিশ্বভারতী বিভিন্ন বিভাগে জগদানন্দ রায়ের শতপূর্তিবর্ষে যে কৃত্যসূচী পালন করেছেন ও করবেন তার বিবরণ :

বিশ্বভারতী নিউজ জগদানন্দের শতবর্ষপূর্তির মাসে একটি বিশেষ সংখ্যা প্রকাশ করেছেন; বিশ্বভারতী পত্রিকা একটি ক্রোড়পত্র প্রকাশ করছেন, তাতে জগদানন্দ রায় সম্বন্ধে প্রবন্ধ ও তাঁর বিস্তারিত গ্রন্থসূচী এবং জগদানন্দ রায়কে লিখিত রবীন্দ্রনাথের পত্রাবলী মুদ্রিত হবে। ৭ পৌষে রবীন্দ্রসদনে জগদানন্দের পাণ্ডুলিপি, চিঠিপত্র, গ্রন্থাবলীর ও প্রতিকৃতির একটি প্রদর্শনীর আয়োজন হয়েছে; এই সঙ্গে বিশ্বভারতীর কর্মীমণ্ডলীর উদ্যোগে বিশ্বভারতীর বিভিন্ন বিজ্ঞানবিভাগ সম্মিলিত ভাবে রবীন্দ্রসদনে একটি বিজ্ঞান-প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করেছেন।

প্রাক্তন ছাত্রদের সভা. শান্তিনিকেতন আশ্রমিক সংঘের উদ্যোগে এই শতবর্ষপূর্তি উপলক্ষ্যে ৭ পৌষ একটি স্মরণসভার আয়োজন হয়েছে। জগদানন্দের উদ্দেশে নিবেদিত তাঁর ছাত্র ও অনুরাগী -বৃন্দের শ্রদ্ধাঞ্জলি সংগ্রহ করে একখানি গ্রন্থে সন্নিবদ্ধ করবার সংকল্পও সংঘ প্রকাশ করেছেন।

…আমি ছিলেম তখন ‘সাধনা’র লেখক এবং পরে তার সম্পাদক। সেই সময়ে তাঁর সঙ্গে আমার পরিচয়ের সূত্রপাত হয়। ‘সাধনা’য় পাঠকদের তরফ থেকে বৈজ্ঞানিক প্রশ্ন থাকত। মাঝে মাঝে আমার কাছে তার এমন উত্তর এসেছে যার ভাষা স্বচ্ছ সরল—বৈজ্ঞানিক প্রসঙ্গে এমন প্রাঞ্জল বিবৃতি সর্বদা দেখতে পাওয়া যায় না। পরে জানতে পেরেছি এগুলি জগদানন্দের লেখা, তিনি তাঁর স্ত্রীর নাম দিয়ে পাঠাতেন। তখনকার দিনে বৈজ্ঞানিক সমস্যার এরূপ সুন্দর উত্তর কোনো স্ত্রীলোক এমন সহজ ক’রে লিখতে পারেন ভেবে বিস্ময় বোধ করেছি। একদিন যখন জগদানন্দের সঙ্গে পরিচয় হ’ল তখন তাঁর দুঃস্থ অবস্থা এবং শরীর রুগ্ন। আমি তখন শিলাইদহে বিষয়কর্মে রত। সাহায্য করবার অভিপ্রায়ে তাঁকে জমিদারী কর্মে আহ্বান করলেম। সেদিকেও তাঁর অভিজ্ঞতা ও কৃতিত্ব ছিল। মনে আক্ষেপ হ’ল— জমিদারি সেরেস্তা তাঁর উপযুক্ত কর্মক্ষেত্র নয়, যদিও সেখানেও বড় কাজ করা যায় উদার হৃদয় নিয়ে। জগদানন্দ তার প্রমাণ দিয়েছেন। কিন্তু সেখানে তিনি বারংবার জ্বরে আক্রান্ত হয়ে অত্যন্ত দুর্বল হয়ে পড়লেন। তাঁর অবস্থা দেখে মনে হল তাঁকে বাঁচানো শক্ত হবে। তখন তাঁকে অধ্যাপনার ক্ষেত্রে আহ্বান করে নিলুম শান্তিনিকেতনের কাজে। আমার প্রয়োজন ছিল এমন সব লোক, যাঁরা সেবাধর্ম গ্রহণ করে এই কাজে নামতে পারবেন, ছাত্রদেরকে আত্মীয়জ্ঞানে নিজেদের শ্রেষ্ঠ দান দিতে পারবেন। বলা বাহুল্য, এ রকম মানুষ সহজে মেলে না। জগদানন্দ ছিলেন সেই শ্রেণীর লোক। স্বল্পায়ু কবি সতীশ রায় তখন বালক, বয়স উনিশের বেশি নয়। সেও এসে এই আশ্রমগঠনের কাজে উৎসর্গ করলে আপনাকে। এঁর সহযোগী ছিলেন মনোরঞ্জন বাঁড়ুজ্যে, এখন ইনি

সম্বলপুরের উকিল, সুবোধচন্দ্র মজুমদার, পরে ইনি জয়পুর স্টেটে কর্মগ্রহণ করে মারা গিয়েছেন।

বিদ্যাবুদ্ধির সম্বল অনেকের থাকে, সাহিত্য বিজ্ঞানে কীর্তিলাভ করতেও পারেন অনেকে, কিন্তু জগদানন্দের সেই দুর্লভ গুণ ছিল যার প্রেরণায় কাজের মধ্যে তিনি হৃদয় দিয়েছেন। তাঁর কাজ আনন্দের কাজ ছিল, শুধু কেবল কর্তব্যের নয়। তার প্রধান কারণ, তাঁর হৃদয় ছিল সরস, তিনি ভালোবাসতে পারতেন। আশ্রমের বালকদের প্রতি তাঁর শাসন ছিল বাহ্যিক, স্নেহ ছিল আন্তরিক। অনেক শিক্ষক যাঁরা দূরত্ব রক্ষা করে ছেলেদের কাছে মান বাঁচিয়ে চলতে চান, নিকট-পরিচয়ে ছেলেদের কাছে তাঁদের মান বজায় থাকবে না এই আশঙ্কা তাঁদের ছাড়তে চায় না। জগদানন্দ একই কালে ছেলেদের সুহৃদও ছিলেন সঙ্গী ছিলেন অথচ শিক্ষক ছিলেন অধিনায়ক ছিলেন—ছেলেরা আপনারাই তাঁর সম্মান রেখে চলত—নিয়মের অনুবর্তী হয়ে নয়, অন্তরের শ্রদ্ধা থেকে। সন্ধ্যার সময় ছাত্রদের নিয়ে তিনি গল্প বলতেন। মনোজ্ঞ করে গল্প বলবার ক্ষমতা তাঁর ছিল। তিনি ছিলেন যথার্থ হাস্যরসিক, হাসতে জানতেন। তাঁর তর্জনের মধ্যেও লুকানো থাকত হাসি। সমস্ত দিন কর্মের পর ছেলেদের ভার গ্রহণ করা সহজ নয়। কিন্তু তিনি তাঁর নির্দিষ্ট কর্তব্যের সীমানা অতিক্রম করে স্বেচ্ছায় স্নেহে নিজেকে সম্পূর্ণ দান করতেন।

অনেকেই জানেন ক্লাসের বাইরেও ছেলেদের ডেকে ডেকে তাদের লেখাপড়ায় সাহায্য করতে কখনোই তিনি আলস্য করতেন না। নিজের অবকাশ নষ্ট করে অকাতরে সময় দিতেন তাদের জন্যে।

কর্তব্যসাধনের দ্বারা দাবি চুকিয়ে দিয়ে প্রশংসা লাভ চলে। কর্তব্যনিষ্ঠতাকে মূল্যবান বলেই লোকে জানে। দাবির বেশি যে দান সেটা কর্তব্যের উপরে, সে ভালোবাসার দান। সে অমূল্য, মানুষের

চরিত্রে যেখানে অকৃত্রিম ভালোবাসা সেইখানেই তার অমৃত। জগদানন্দের স্বভাবে দেখেছি সেই ভালোবাসার প্রকাশ, যা সংসারের সাধারণ সীমা ছাড়িয়ে তাকে চিরন্তনের সঙ্গে যোগযুক্ত করেছে। আশ্রমে এই ভালোবাসা সাধনার আহ্বান আছে। নির্দিষ্ট কর্ম সাধন করে তারপর ছুটি নিয়ে একটি ক্ষুদ্র পরিধির মধ্যে নিজেকে বদ্ধ রাখতে চান যাঁরা, সে রকম শিক্ষকের সত্তা এখানে ক্ষীণ অস্পষ্ট। এমন লোক এখানে অনেকে এসেছেন গেছেন পথের পথিকের মতো। তাঁরা যখন থাকেন তখনো তাঁরা অপ্রকাশিত থাকেন, যখন যান তখনো কোনো চিহ্নই রেখে যান না।

এই যে আপনার প্রকাশ, এ ন মেধয়া ন বহুনা শ্রুতেন— এ প্রকাশ ভালোবাসায়, কেননা, ভালোবাসাতেই আত্মার পরিচয়। জগদানন্দের যে দান সে প্রাণবান, সে শুধু স্মৃতিপটে চিহ্ন রাখে না, তা একটি সক্রিয় শক্তি যা সৃষ্টিপ্রক্রিয়ার মধ্যে থেকে যায়। আমরা জানি বা না-জানি বিশ্ব জুড়ে এই প্রেম নিয়তই সৃষ্টির কাজ করে চলেছে। কেবল শক্তি দান করে সৃষ্টি হয় না, আত্মা আপনাকে দান করার দ্বারাই সৃষ্টিকে চালনা করে। বেদে তাই ঈশ্বরকে বলেছেন, "আত্মদা বলদা"। যেখানে আত্মা নেই শুধু বল সেখানে প্রলয়।

আমি এই জানি আমাদের কাজ পুনরাবৃত্তির কাজ নয়, নিরন্তর সৃষ্টির কাজ। এখানে তাই আত্মদানের দাবি রাখি। এই দানে সীমা নেই। এ দশটা-চারটের মধ্যে ঘের-দেওয়া কাজ নয়। এ যন্ত্র-চালনা নয়, এ অনুপ্রাণন।

আজ শ্রাদ্ধের দিনে জগদানন্দের সেই আত্মদানের গৌরবকে স্বীকার করছি। এখানে তিনি তাঁর কর্মের মধ্যে কেবল সিদ্ধিলাভ করেন নি অমৃতলাভ করেছেন। কেননা তিনি ভালোবেসেছেন আনন্দ পেয়েছেন। আপনার দানের দ্বারা উপলব্ধি করেছেন আপনাকে।...

১৩৪০

বিজ্ঞানশিক্ষক ও বিজ্ঞানসাহিত্যিক জগদানন্দ রায়ের স্মৃতি শান্তিনিকেতন বিদ্যালয়ের সঙ্গে অচ্ছেদ্যভাবে জড়িত। এখানেই তাঁর শক্তির বিকাশ, প্রতিষ্ঠা ও মৃত্যু। অবশ্য তাঁর শক্তির বিকাশ পরবর্তীকালে শান্তিনিকেতনের সীমা পার হয়ে বাংলা সাহিত্যের ক্ষেত্রে প্রবেশ করেছিল এবং একজন কৃতী বিজ্ঞানসাহিত্যিক রূপে তিনি প্রতিষ্ঠালাভ করে গিয়েছেন। তাঁর জন্মশতক উপলক্ষে আলোচনা করতে গেলে শান্তিনিকেতন ও বাংলা সাহিত্য দুটি ক্ষেত্রেই তাঁকে স্মরণ করতে হবে। তাঁর শক্তির একটি ধারা প্রবাহিত ঐ প্রতিষ্ঠানটির মধ্যে, আর-একটি ধারা বাংলা সাহিত্যে প্রবাহিত হয়ে সাধারণের গোচরীভূত হয়েছে। আবার ধারা দুটির একটি অন্যটির নিরপেক্ষ নয়, একটি অন্যটিকে পুষ্ট করেছে। শান্তিনিকেতনে শিক্ষকরূপে কাজ করবার যে সুযোগ তিনি পেয়েছিলেন, রবীন্দ্রনাথের আগ্রহে বিজ্ঞানচর্চার যে সুবিধা পেয়েছিলেন দুটিকে একত্র জড়িয়ে বিচার করা আবশ্যক। এ কেমন করে সম্ভব হল জানতে হলে পূর্বকথা তোলা আবশ্যক।

রবীন্দ্রনাথের বয়স যখন ত্রিশ বছর তখন জমিদারির তদারকি করবার উদ্দেশ্যে বছর দশেক তাঁকে সপরিবারে কাটাতে হয়েছিল শিলাইদহে। ছেলেমেয়েদের শিক্ষাদানের উপযোগী কোনো বিদ্যালয় সেখানে ছিল না, অথচ ছেলেমেয়ে দুটির শিক্ষার বয়স হয়েছে। তখন তিনি একটি গৃহবিদ্যালয় স্থাপন করলেন। বললে অন্যায় হবে না যে এই গৃহবিদ্যালয় পরবর্তীকালে স্থাপিত শান্তিনিকেতন বিদ্যালয়ের খসড়া ও আদিরূপ। এই বিদ্যালয়ে যে কয়েকজন শিক্ষক তিনি নিযুক্ত করেছিলেন তাঁদের মধ্যে একজন জগদানন্দ রায়। এঁদের মধ্যে আরো কয়েকজন ছিলেন। একজন ইংরেজ, নাম লরেন্স। আর ছিলেন শিবধন বিদ্যার্ণব, আর

সুবোধচন্দ্র মজুমদার। লরেন্স ছাড়া আর সকলেই পরে শান্তিনিকেতনে এসেছিলেন শিক্ষকরূপে। ১৯০১ সালে রবীন্দ্রনাথ সপরিবারে শিলাইদহ ত্যাগ করে কলকাতা চলে আসেন, পরে ঐ সালেই ৮ই পৌষ তারিখে শান্তিনিকেতনে বিত্থালয়ের পত্তন করেন। তখন গণিতশিক্ষকরূপে সঙ্গে এলেন জগদানন্দ রায়। ১৯০১ সাল থেকে ১৯৩৩ সালে মৃত্যু পর্য্যন্ত জগদানন্দবাবু শান্তিনিকেতনে ছিলেন। মৃত্যুর কয়েক বছর আগে শিক্ষকতার কাজ পরিত্যাগ করলেও সেখানেই বাড়ি তৈরি করে তিনি বাস করছিলেন। এখানেই তাঁর সূচনা বিজ্ঞানচর্চার ও বিজ্ঞান-সাহিত্য রচনার। এর আগে সাধনা পত্রিকায় বৈজ্ঞানিক বিষয় নিয়ে তিনি প্রবন্ধাদি লিখেছেন। সরলভাষায় বৈজ্ঞানিক বিষয় লিখবার তাঁর ক্ষমতা রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। সেইজন্যেই শান্তিনিকেতনে তিনি নিয়ে আসেন জগদানন্দ রায়কে। ভালোই করেছিলেন, নতুবা তাঁর শক্তি বিকাশের সুযোগ অভাবে নষ্ট হয়ে যেত, আর বাংলা ভাষায় যাঁরা সহজবোধ্যভাবে বৈজ্ঞানিক্ নিয়ে লিখেছেন তাঁদের মধ্যে তাঁর স্থান হত না। শান্তিনিকেতনের আদিপর্বে এমন আরো কয়েকজন ব্যক্তিকে রবীন্দ্রনাথ আকর্ষণ করে নিয়ে এসেছিলেন, বিধুশেখর শাস্ত্রী, ক্ষিতিমোহন সেন ও হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতিকে, যাঁরা পরবর্তী-কালে স্ব স্ব ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠা লাভ করে গিয়েছেন।

বাংলা বিজ্ঞানসাহিত্যের ইতিহাসে অক্ষয় দত্তকে প্রথম বলে ধরলে দেখা যাবে যে এর মধ্যে মহারথীরা অনেকেই আছেন। এক সময়ে বঙ্কিমচন্দ্রকে বঙ্গদর্শনের পাঠকদের জন্য বিজ্ঞানসাহিত্য রচনা করতে হয়েছে। তার পরে আছেন রামেন্দ্রসুন্দর ও রবীন্দ্রনাথ। রামেন্দ্রসুন্দর বিজ্ঞানের অধ্যাপক ছিলেন। বিজ্ঞানবিষয়ক রচনা তাঁর সুপ্রচুর। সে-সব কতকপরিমাণে দর্শনের কোঠায় গিয়ে পড়েছে। নৈসর্গিক সত্যকে নৈতিক সত্যের সঙ্গে মিলিয়ে ব্যাখ্যা দিতে চেষ্টা করেছেন

তিনি। রবীন্দ্রনাথের বিশ্বপরিচয় বিজ্ঞান ও সাহিত্য দুইই। কিন্তু বাঙালী বৈজ্ঞানিকগণ যথা জগদীশচন্দ্র বসু, প্রফুল্লচন্দ্র রায়, মেঘনাদ সাহা প্রভৃতি সকলেরই মূল বৈজ্ঞানিক গ্রন্থগুলি ইংরেজি ভাষায় লিখিত। হয়তো বাংলা ভাষা এখনো সে-সব বিষয় প্রকাশের উপযোগী হয়ে ওঠে নি বলেই তাঁরা ইংরেজিতে লিখেছেন।

জগদানন্দ রায়ের নামটিও রয়ে গিয়েছে বাংলা বিজ্ঞানসাহিত্যের ধারার মধ্যে। তাঁর প্রথম আমলের বইগুলির মধ্যে আছে আচার্য্য জগদীশচন্দ্রের আবিষ্কার, বৈজ্ঞানিকী, প্রাকৃতিকী, গ্রহ-নক্ষত্র ইত্যাদি। আবার শেষের দিকের বইগুলির মধ্যে আছে পোকামাকড়, গাছপালা, মাছ ব্যাঙ সাপ ইত্যাদি। প্রথম আমলের বইগুলোতে বৈজ্ঞানিক কৌতূহল আছে, দুরূহ বিষয়কে সহজবোধ্য করে বলবার প্রচেষ্টা আছে, এই পর্যন্ত। শেষের দিকের বইগুলোতে এ সমস্তর সঙ্গে আছে ব্যক্তিগত অনুসন্ধিৎসার ফল। সেকালের শান্তিনিকেতনের অধিবাসীগণ লক্ষ্য করতেন যে, নানারকম পোকামাকড় মাছ ব্যাঙ প্রভৃতির জীবনযাত্রা লক্ষ্য করা জগদানন্দবাবুর অভ্যাস। কাচের বড় বড় বোতলে, বা কাঠের বাক্সে পোকামাকড় কাঁকড়াবিছা পালন করা তাঁর অভ্যাস ছিল, আগ্রহের সঙ্গে এদের জীবনযাত্রাকে তিনি দেখতেন। কাজেই শেষ দিকের বইগুলো কেবল পরের গবেষণার উপরে নির্ভর করে লিখিত নয়, পরের গবেষণার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে নিজের অধ্যবসায় আর আবিষ্কার। তার পরে ভাষাটা আরো সরল হয়ে এসেছে, জটিল বিষয়কে ঘরোয়াভাবে প্রকাশ করবার ক্ষমতা বৃদ্ধি পেয়েছে। সত্য কথা বলতে কি, এই গ্রন্থগুলোর উপরেই তাঁর খ্যাতির দাবি। একসময়ে এসব বই বাংলা-দেশের বিদ্যালয়গুলোতে বহুপঠিত ছিল, সাধারণ পাঠকসমাজেও আদৃত ছিল। এগুলোর প্রযোজ্যতা সম্পূর্ণ নিঃশেষ হয়ে গিয়েছে মনে করবার কারণ নেই। তবে কি, বৈজ্ঞানিক রচনার মূল্য কালান্তরে কমে

আসতে বাধ্য, কারণ যে-নূতনত্ব তার ভিত্তি সেই নূতনত্ব ক্রমে পুরাতন হয়ে আসে। নিউটনের মহৎ আবিষ্কার এখন শিক্ষিতসাধারণের সম্পত্তি। এ হতেই হবে। বাংলা ভাষায় এর ব্যতিক্রম রামেন্দ্রসুন্দরের রচনা ও রবীন্দ্রনাথের 'বিশ্বপরিচয়'। কারণ, এসব গ্রন্থে বিজ্ঞানের অতিরিক্ত কিছু আছে, সেই কিছুই এদের টিকিয়ে রেখেছে। রামেন্দ্র-সুন্দরের আছে বিজ্ঞানের তথ্যের সঙ্গে দর্শনের সত্য, দুয়ে মেলাবার চেষ্টা, ফলে বিষয়টা জড়বিজ্ঞানের স্তর থেকে উন্নততর হয়ে তাত্ত্বিক পদবী লাভ করেছে। বিজ্ঞানের তথ্য পুরাতন হতে পারে কিন্তু সেই তথ্য তত্ত্বে পরিণত হলে তখন তো আর সেটা জড়বিজ্ঞানের ব্যাপার থাকে না। এইজন্যই রামেন্দ্রসুন্দরের বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ আজও সজীব। আর রবীন্দ্রনাথের বিশ্বপরিচয়ে আছে কবিত্ব ও কবিকল্পনার লীলা। এইজন্যই বইখানার একপ্রকার মূল্য শেষ পর্যন্ত থেকে যাবে। জগদানন্দ রায়ের খ্যাতির দাবি অন্য ধরণের। গ্রন্থ হিসাবে তাঁর রচনা যে সব টিকে থাকবে তা না হতেও পারে, তবে সহজবোধ্য বিজ্ঞানরচনার ধারায় প্রবর্তকদের মধ্যে তাঁকে অবশ্যই ধরতে হবে। আজকাল অনেক চিন্তাশীল ব্যক্তি বলে থাকেন বাংলা ভাষায় বিজ্ঞান লিপিবদ্ধ হওয়া উচিত। উচিত বললেই ঔচিত্য মেনে নেবে ভাষা এমন বশংবদ নয়। দীর্ঘকালের প্রচেষ্টায় ভাষাকে গড়েপিটে তৈরি করে নিতে হয়। সাহিত্যের সমস্ত শাখা সম্বন্ধেই এ কথা খাটে। বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ ও প্রমথ চৌধুরীর প্রচেষ্টা সত্ত্বেও বাংলা সমালোচনা-সাহিত্যের ভাষা আজও সম্পূর্ণ গড়ে ওঠে নি। সমালোচনা লিখতে বসে হয় আমরা কবিত্ব করি, নয় ভাবালুতা করি, নয় দুরূহত্বের লোষ্ট্র নিক্ষেপ করি। তারপরে ট্রাজেডির ভাষাও এখনো বাংলা সাহিত্যে খুব কাঁচা, ট্রাজেডি লিখতে বসে হয় আমরা কেঁদে ভাসাই নয় তত্ত্বের কুজ্ঝটিকা সৃষ্টি করে বসি। এসব যদি সত্য হয় তবে বুঝতে পারা যাবে বিজ্ঞানের ভাষা রচনা

করা কত শক্ত। বহুদিনের ও বহুজনের অধ্যবসায়ে পরিশ্রম প্রচেষ্টা ও প্রতিভার ফলে এ ভাষা গড়ে ওঠে। বলা বাহুল্য বাংলা ভাষায় বিজ্ঞানরচনার পথটা এখনো নিতান্ত কাঁচা ও অনিশ্চিত। বিদ্যালয়ের পাঠ্য বই ছাড়া যথার্থ বিজ্ঞানসাহিত্য বাংলা ভাষায় গড়ে উঠতে এখনো বিলম্ব আছে। তার পরে ঐ ভাষার সঙ্গেই যোগ রয়েছে আর একটি বিষয়ের। বাঙালী বৈজ্ঞানিক যখন বাংলা ভাষায় চিন্তা করতে শুরু করবেন তখন পথের প্রধান বাধা দূর হবে, এখনো তাঁদের চিন্তার মাধ্যম ইংরেজি ভাষা। জগদানন্দবাবু কেবল যে বাংলা ভাষায় লিখেছেন তা নয় তিনি বাংলা ভাষায় চিন্তা করেছেন। এখানেই তাঁর প্রধান কৃতিত্ব। সেই ক্ষীণ ধারা সম্পূর্ণ লোপ পেয়েছে এমন বলি না, তবে প্রশস্ততর হয়নি নিশ্চয়। এই ক্ষীণ ধারা যাঁদের চেষ্টায় আজও বহতা আছে তাঁদের প্রতিনিধি হিসাবে বসু-বিজ্ঞান-মন্দিরের অক্লান্ত কর্মী ও লেখক শ্রীগোপালচন্দ্র ভট্টাচার্যের নাম করা যেতে পারে, না করলে বাংলা বিজ্ঞানসাহিত্যের সম্বন্ধে হতাশা পোষণ করা হবে।

এবারে যে-পরিবেশের মধ্যে জগদানন্দবাবুর শক্তির বিকাশ হয়েছিল সেই শান্তিনিকেতনের সঙ্গে তাঁর সম্বন্ধ বিষয়ে কিছু বলা যেতে পারে। এ আদিযুগের ক্ষুদ্র প্রতিষ্ঠান শান্তিনিকেতন, নিত্য অভাবগ্রস্ত, কয়েকটি কাঁচা পাকা বাড়ি আর ছাত্র শিক্ষক ভৃত্যাদি মিলে শ দেড়েক লোকের বাসস্থান। এই প্রতিষ্ঠানের প্রধান ব্যক্তিদের মধ্যে অন্যতম জগদানন্দবাবু। বিচিত্র তাঁর ভূমিকা। কখনো তিনি ছাত্রদের আহারের তদারকি করছেন, কখনো সবজির বাগানে পরিদর্শন করছেন, কখনো শূন্য তহবিলের সম্মুখে বসে নিছক গণিতবিদ্যায় ঘাটতি পূরণের ব্যর্থ চেষ্টা করছেন, কখনো মালতীকুঞ্জের তলে বসে গণিতের অধ্যাপনা করছেন, আবার কখনো বা পুরানো দূরবীণটা মাঠের মধ্যে টেনে নিয়ে এসে

গ্রহনক্ষত্র পর্যবেক্ষণ করছেন। এরই মধ্যে জীর্ণ কুটিরের দাওয়ায় বসে বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধগুলি রচনা করছেন। গায়ে কোঁচার কাপড়, পায়ে একজোড়া পুরানো চটি, মুখে কড়া চুরুট। বয়স্ক ছাত্ররা আড়ালে তাঁকে বলে দাদা। আর কিছুই নয়, রবীন্দ্রনাথের ফাল্গুনী নাটকে দাদার ভূমিকা অভিনয় করবার পরে ঐ দাদা নামটা কায়েম হয়ে বসেছিল। বলতে ভুলে গিয়েছি যে তিনি নিপুণ অভিনেতা ছিলেন। শারদোৎসব নাটকে লক্ষেশ্বরের ভূমিকা, অচলায়তন নাটকে মহাপঞ্চক এবং ফাল্গুনী নাটকে দাদার ভূমিকা অভিনেতা হিসাবে তাঁর শ্রেষ্ঠ কীর্তি। সে-সব ভূমিকা দর্শকদের মনে এমনি বসে গিয়েছিল যে আজ পঞ্চাশ বছর পরেও ঐ সব নাটক পড়বার সময়ে তাঁর কণ্ঠস্বর ও চেহারা মনে পড়ে যায়। আমার বিশ্বাস ফাল্গুনী নাটক রচনার সময়ে জগদানন্দবাবুকেই চোখের সম্মুখে রেখে রবীন্দ্রনাথ দাদার চরিত্র পরিকল্পনা করেছিলেন। নানা ভূমিকায় শান্তিনিকেতনের পক্ষে তিনি অপরিহার্য ছিলেন। শিক্ষক, হেড্‌মাস্টার বা সর্বাধ্যক্ষ, কোষাধ্যক্ষ, ছাত্রশাসক, অভিনেতা এবং প্রয়োজনক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথের পরামর্শদাতা। রবীন্দ্রনাথের উপরে তাঁর যেমন প্রগাঢ় শ্রদ্ধাভক্তি ছিল, রবীন্দ্রনাথেরও তাঁর উপরে তেমনি ছিল গভীর আস্থা। অনেক কৃতী শিক্ষক সেখানে এসেছেন গিয়েছেন, জগদানন্দবাবু সেই যে ১৯০১ সালে এসেছিলেন আর যান নি, যাওয়ার কথাও ভাবেন নি, একেবারে গেলেন শেষ যাওয়ায় মৃত্যুর দ্বার দিয়ে বের হয়ে। তিনি যেমন শান্তিনিকেতনকে গড়ে তুলতে সাহায্য করেছিলেন, শান্তিনিকেতনও সুযোগ-সুবিধা দিয়ে তেমনি তাঁকে গড়ে তুলেছিল দেশের একজন বৈজ্ঞানিক লেখক হিসাবে। বাংলা ভাষায় বিজ্ঞানসাহিত্যের ধারায় তাঁর স্থান স্থায়ীভাবে নির্দিষ্ট হয়ে গিয়েছে অন্যান্য কৃতী বৈজ্ঞানিক লেখকদের সঙ্গে।

১৩৭৬

জগদানন্দ রায় মশায়ের কাছে পড়বার সৌভাগ্য আমার হয় নি তথাপি তিনি আমার শিক্ষক ছিলেন। তাঁকে কখনো আমি চোখে দেখি নি তাহলেও তাঁর সঙ্গে খানিকটা আমার পরিচয় হয়েছিল। কথাগুলি বোধকরি ধাঁধার মতো শোনাচ্ছে। তাহলে একটু খুলে বলা দরকার। সাধারণতঃ যাঁর কাছে আমরা ইস্কুল বা কলেজের ক্লাসে বসে পড়ি তাঁকেই আমরা বলি শিক্ষক, কিন্তু খাঁটি শিক্ষক যাঁরা তাঁরা ক্লাসের বাইরেও শিক্ষক। শিক্ষাদানের কাজটা ক্লাসের পড়া তৈরি করানোতেই শেষ হয়ে যায় না। তাঁদের অনেক কিছু দেবার আছে, ক্লাসের রুটিন-বাঁধা কাজের বাইরেই সেটা দেওয়া সম্ভব। জগদানন্দবাবু ক্লাসে অঙ্ক শেখাতেন কিন্তু সন্ধ্যাবেলায় ছেলেদের নিয়ে বসে বিজ্ঞানের গল্প বলতেন— গ্রহনক্ষত্র, জন্তু-জানোয়ার, গাছপালা, পোকামাকড়, পাখির কথা। ইস্কুলে একটা টেলিস্কোপ ছিল। কোনো-কোনোদিন রাত্তিরবেলায় সেই টেলিস্কোপের সাহায্যে ছেলেদের গ্রহনক্ষত্র চিনিয়ে দিতেন। ক্রমে গুরুদেবের উৎসাহ পেয়ে ছেলেমেয়েদের জন্যে বিজ্ঞানের নানা বিষয় নিয়ে বই লিখতে লাগলেন। ছেলেবেলায় আমি তার দুচারখানা বই পড়েছি এবং পড়ে খুব আনন্দ পেয়েছি। অনেক কথা শিখেছিও। সেই কারণেই বলেছি যে আমি তাঁর ক্লাসের ছাত্র না হয়েও তাঁকে শিক্ষক হিসাবে পেয়েছিলাম।

এবার পরিচয়ের কথাটা বলি। আমি যখন খুব ছোট—শিশুবিভাগের ছেলেদের মতো বয়েস—তখন আকাশে হ্যালির ধূমকেতু দেখা দিয়েছিল। আমার সে বয়সে এমন অত্যাশ্চর্য জিনিস আমি আর দেখি নি। ধূমকেতু ব্যাপারটা কি জানবার জন্যে মনে খুব কৌতুহল হয়েছিল। আমার পিতা সাধ্যমত ধূমকেতু সম্বন্ধে আমাকে কিছু কিছু বলেছিলেন। আর

বলেছিলেন, ভালো করে জানতে চাও তো শান্তিনিকেতনে জগদানন্দ রায় মশায়কে লেখ, তিনি সব কথা ভালো করে বুঝিয়ে দেবেন। আমি অনেক ভেবে চিন্তে আমার আঁকাবাঁকা অক্ষরে তাঁকে এক চিঠি লিখে পাঠিয়েছিলাম। খুব আশ্চর্যের কথা যে দু দিন যেতে-না-যেতেই চিঠির জবাব এসে গেল। দু পাতাজোড়া লম্বা এক চিঠি। তাতে কী সুন্দর করে যে ধুমকেতুর ইতিবৃত্তান্ত লিখে পাঠিয়েছিলেন সে কী বলব! আমি যে নিতান্তই নাবালক সে তিনি আমার হাতের লেখা দেখেই বুঝেছিলেন কিন্তু তাই বলে আমাকে এতটুকু উপেক্ষা করেন নি। যাঁরা জাত-শিক্ষক তাঁরা ছোটদের যেমন ভালোবাসেন তেমনি শ্রদ্ধাও করেন। তাঁর কাছ থেকে পাওয়া সে চিঠি আমার শিশুবয়সের সব চাইতে বড় গর্বের বস্তু ছিল। বুক ফুলিয়ে অনেকের কাছে বলেছি, ইস্কুলে গিয়ে আমার বন্ধুদের দেখিয়েছি।

চিঠি নয় তো, মনে হয়েছে যেন আমার পাশে বসে ধূমকেতুর গল্প বলে যাচ্ছেন। এমনিতেও শুনেছি গল্প বলবার অদ্ভুত ক্ষমতা ছিল। সন্ধ্যেবেলায় ছেলেদের নিয়ে যখন গল্প বলতে বসতেন তখন ছেলেরা মাঝে মাঝে বলত, ভূতের গল্প বলুন। জগদানন্দবাবু বলতেন, বেশ তাই হবে। আগে তাহলে আলোটা নিবু-নিবু করে দাও। বাইরে ঝিঁঝিঁ ডাকছে, ঘরের মধ্যে আধো-অন্ধকারে তিনি ভূতের গল্প জুড়ে দিতেন, ছেলেদের গায়ে কাঁটা দিত। অদ্ভুত বলবার ভঙ্গি। বিজ্ঞানের কথা যখন আলোচনা করেছেন তখনো এমনি করে গল্পই বলেছেন। তবে এখানে ভঙ্গিটা একটু আলাদা। ওখানে যেমন আলোটা নিবু নিবু করতে বলেছেন এখানে বলেছেন, ভালো করে চোখ মেলে দেখো— শালিখ দুটো ঝগড়া করছে কেন? চড়ুই পাখিটা ব্যস্ত হয়ে কি বলছে? ফিঙেটা কি দেখে অত নাচানাচি করছে? কিম্বা এই দেখ পোকা-খেগো গাছ কেমন পোকা ধরে খাচ্ছে! ইত্যাদি ইত্যাদি। এখানে

বলা আবশ্যক যে ঐ গল্প বলার রীতি তাঁর লেখার আর্টকে যথেষ্ট সাহায্য করেছে। বিজ্ঞানের নানা দিক নিয়ে জগদানন্দবাবু অন্তত বাইশখানা বই লিখেছেন, তার প্রত্যেকটি ঐ মনোরম ভঙ্গিতে লেখা। ঠিক যেন গল্প বলে যাচ্ছেন। পড়বার সময় মনে হবে ছাপার অক্ষরগুলো কথা বলছে। বিদ্যালয়ের ছেলেমেয়েদের কাছে যে বিজ্ঞানের গল্প বলতেন এসব বই এর মারফত সারা বাংলা দেশের ছেলেমেয়েদের তিনি সে গল্প শুনিয়েছেন। সেদিক থেকে তিনি শুধু শান্তিনিকেতন বিদ্যালয়ের শিক্ষক নন, সমস্ত বাংলা দেশেরই বিজ্ঞানশিক্ষকের আসন গ্রহণ করেছিলেন। বাংলা দেশের শিক্ষাবিস্তারের ইতিহাসে জগদানন্দবাবুর এই ভূমিকাটি বিশেষ-ভাবে স্মরণযোগ্য।

শান্তিনিকেতন সম্বন্ধে একটি কথা আজ অনেকেই ভুলে বসে আছেন। শান্তিনিকেতনকে গুরুদেব সমগ্র বাংলা দেশের জন্য শিক্ষার একটি বিকিরণকেন্দ্র হিসাবে ব্যবহার করেছেন। ঐ উদ্দেশ্যেই হরিচরণ-বাবুকে বাংলা ভাষার সুবৃহৎ অভিধান রচনায় নিযুক্ত করেছিলেন, ক্ষিতিমোহনবাবুকে মধ্যযুগীয় সাধুসন্তদের বাণী সন্ধানে এবং ব্যাখ্যানে উৎসাহিত করেছিলেন এবং বিধুশেখর শাস্ত্রী মশায়কে বৌদ্ধশাস্ত্র আলোচনায় প্রেরণা জুগিয়েছিলেন। রবীন্দ্রনাথ নিজে রসের জোগান দিয়েছেন, অজিতকুমার চক্রবর্তী সে রসের আলোচনায় আমাদের সমালোচনা-সাহিত্যকে পুষ্ট করেছেন। অর্থাৎ ঘটা করে বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন না করেও তিনি গোড়া থেকেই বিশ্ববিদ্যালয়ের মুখ্য কাজে হাত দিয়েছিলেন।

শিক্ষক নির্বাচনে গুরুদেবের একটি বিশেষ পরীক্ষা ছিল। দেখে নিতেন ক্লাসে পড়ানোর আটপৌরে কাজটি ছাড়া আর কিছু এঁর দ্বারা হবে কিনা অর্থাৎ এঁর মধ্যে প্রাত্যহিক প্রয়োজনের অতিরিক্ত উদ্বৃত্ত কিছু আছে কিনা। ঐ উদ্বৃত্তটি না থাকলে তিনি কাউকে শিক্ষক

নামের মর্যাদা দিতেন না। হরিচরণবাবু এবং জগদানন্দবাবু দুজনেই জমিদারি সেরেস্তায় কাজ করতেন। হরিচরণবাবুকে গুরুদেব জিজ্ঞেস করেছিলেন, সারাদিন তো সেরেস্তার কাজ কর, বাকী সময়টা কি কর? হরিচরণবাবু সসংকোচে বলেছিলেন, সংস্কৃত কাব্যে সাহিত্যে সামান্য অনুরাগ আছে, অবসর সময়ে একটু সংস্কৃতের চর্চা করি। ব্যস্ গুরুদেব তখনই মনস্থির করে নিয়েছেন। কিছুদিনের মধ্যেই কাছারির ম্যানেজারের কাছে চিঠি এল, তোমাদের সংস্কৃতজ্ঞ কর্মচারীটিকে এখানে পাঠিয়ে দাও। জগদানন্দবাবুর বেলায়ও ঐ একই ব্যাপার ঘটেছে। জগদানন্দবাবুর লেখা বিজ্ঞানসম্বন্ধীয় দু-একটি প্রবন্ধ তখনকার দিনের পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল। লেখার ধরণটা গুরুদেবের মনে ধরেছিল। জগদানন্দবাবুকে আলগোছে জিজ্ঞেস করেছিলেন, সেরেস্তার কাজেই থাকবে না আমার সঙ্গে বিদ্যালয়ের কাজে শান্তিনিকেতনে যাবে? জগদানন্দবাবু হাতে স্বর্গ পেলেন। বলেছিলেন, জমিদারের নায়েব হবার অভিলাষ তাঁর নেই। জীবনে এক নতুন পর্বের শুরু হল। জমিদারের নায়েব হলেন বিজ্ঞানের সেবায়েত। বিজ্ঞানের সেবায় যে কাজ করেছিলেন তার উল্লেখ আগেই করেছি। সে কাজের মাহাত্ম্য স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ স্বীকার করেছেন। বলেছেন, "জ্ঞানের ভোজে এ দেশে তিনিই সব প্রথমে কাঁচাবয়সের পিপাসুদের কাছে বিজ্ঞানের সহজ পথ্য পরিবেশন করেছিলেন।"

জগদানন্দবাবু ইস্কুলে ছাত্রদের অঙ্ক শেখাতেন, তাই বলে তিনি অঙ্কের মাস্টার নন। শিক্ষাব্যবস্থার এই কথাটি বিশেষভাবে মনে রাখা প্রয়োজন যে শিক্ষকের পরিচয় যদি হয়—ইনি বাংলা ইংরেজি অঙ্ক সংস্কৃত কিংবা দর্শন বিজ্ঞানের মাস্টার তাহলেই বুঝতে হবে, তিনি শিক্ষক হিসাবে ব্যর্থ। প্রকৃত শিক্ষক কোনো বিশেষ বিষয়ের শিক্ষক নন—গোটা মানুষটি শিক্ষক অর্থাৎ তাঁর অধ্যয়ন-অধ্যাপনা, কথাবার্তা, হাসিখেলা

রুচি-মরজি, আচার-আচরণ, তাঁর গুণগ্রাম, তাঁর মুদ্রাদোষ সমস্ত মিলিয়ে যে ব্যক্তিত্বটি সেটিই তাঁর শিক্ষক-চরিত্র। বাংলা দেশে শিক্ষক-চরিত্রের সর্বোত্তম আদর্শ বিদ্যাসাগর—সে কি শুধু তাঁর অধ্যাপনার কৃতিত্বগুণে? তিনি সংস্কৃত কলেজে মেঘদূত কুমারসম্ভব পড়াতেন, না সংস্কৃত ব্যাকরণ পড়াতেন সে খবর নিয়ে আজ কে মাথা ঘামায়? প্রতিদিনের বাক্যে কর্মে চিন্তায় যে মহান ব্যক্তিত্বের পরিচয় দিয়েছেন তাতেই তাঁর শিক্ষক-জীবনের মহিমা প্রকাশ পেয়েছে।

শিক্ষককে নানা গুণে গুণান্বিত হতে হয় নতুবা ক্লাসের বাইরে শিক্ষার্থীদের চোখে তাঁর কোনো অস্তিত্ব থাকে না। প্রথম যুগে শান্তিনিকেতনের অধ্যাপকেরা সকলেই একাধিক গুণের অধিকারী ছিলেন। কেউ সুলেখক, কেউ সুগায়ক, কেউ কুশলী অভিনেতা, কেউ ওস্তাদ খেলোয়াড়। কেউ ছবি আঁকছেন, কেউ বা বাদ্যযন্ত্র নিয়ে মেতে আছেন। এ ছাড়া কথায় বার্তায় সকলেই সুরসিক। কোনো-না-কোনো গুণে প্রত্যেকেই ছেলেদের চোখে 'হিরো' হয়েছিলেন। পূর্বে যে উদ্বৃত্তের কথা বলেছি এ সমস্তই সেই উদ্বৃত্তের কথা। শান্তিনিকেতনের শিক্ষার প্রধান কথা এই উদ্বৃত্তের আয়োজন। বলা নিষ্প্রয়োজন যে ক্লাসে অঙ্ক পড়িয়েই জগদানন্দবাবুর শিক্ষকতার কর্তব্য শেষ হয় নি। ক্লাসের বাইরে রান্নাঘরে ছেলেদের খাওয়াদাওয়ার তত্ত্বাবধান করেছেন, অবসর সময়ে ছেলেদের কাছে বিজ্ঞানের গল্প বলেছেন, ঘরে বসে বিজ্ঞানের বই লিখেছেন, ক্লান্তি বোধ করলে আপন মনে বেহালা বাজিয়েছেন, নাটকের সময় অত্যাশ্চর্য অভিনয় করে সকলকে তাক লাগিয়ে দিয়েছেন। শারদোৎসবে লক্ষেশ্বরের ভূমিকায় তাঁর অপূর্ব অভিনয় শান্তিনিকেতনে আজও অভিনয়নৈপুণ্যের দৃষ্টান্তস্বরূপ হয়ে আছে। শিক্ষককে নানান ভূমিকায় দেখলে তবেই তাঁর সহজ 'মানুষী' রূপটি ছাত্রদের চোখে প্রত্যক্ষ হয়ে ওঠে। যে ছাত্ররা ক্লাসে ভয়ে নির্বাক হয়ে থাকত, তারাই নাট্যমঞ্চে

'লক্ষ্মীপ্যাঁচা বেরিয়েছে রে' বলে চেঁচিয়েছে। যৌথ জীবনের যৌগিক মিশ্রণে শিক্ষক-ছাত্রের কৃত্রিম ব্যবধান অনায়াসে ঘুচে যেত। এ ছাড়া কথায় বার্তায় অতিশয় সুরসিক ছিলেন। তাঁর কোনো কোনো উক্তি শান্তিনিকেতনে এখনো প্রবাদবাক্যের ন্যায় মুখে মুখে প্রচারিত।

তাঁর সেই আদর্শ শিক্ষকজীবনকে ঘিরে শান্তিনিকেতনে রীতিমত একটি legend গড়ে উঠেছে। যিনি অনন্যচরিত্রের মানুষ তাঁকে ঘিরে এরূপ legend সৃষ্টি কিছুই অস্বাভাবিক নয়। সে legend উপকথা বা রূপকথার অলীক কাহিনী নয়, সত্য কাহিনী দিয়ে গড়া। এঁরা আর-দশজনের মতো নন বলে এঁদের কথাবার্তা ধরণধারণ লোকের কাছে অদ্ভুত ঠেকে। বলে, এঁরা সব ছিটগ্রস্ত মানুষ। সে যুগে শান্তিনিকেতনের অনেক অধ্যাপকের মাথায় ছিট ছিল। ভাগ্যিস ছিল, তাতেই শান্তিনিকেতনের নিজস্ব একটা চরিত্র গড়ে উঠেছিল। আমি তো বলি, যার মাথায় ছিট নেই তার মাথায় কিছুই নেই। জগদানন্দবাবু সেই ছিটগ্রস্তদেরই একজন। বাইরেটা যেমন রুক্ষ, ভিতরটা তেমনি কোমল। যে ছেলেকে কঠিন বাক্যে জর্জরিত করেছেন, যাকে কিলটা চড়টা মেরেছেন তাকেই আবার ডেকে নিয়ে বিস্কুট বা লজেন্স খাইয়েছেন। জগদানন্দবাবুর হাতে মার খাওয়া ছেলেরা একটা সৌভাগ্য বলে মনে করত। আমাদের সময়ে তনয়বাবুর মধ্যে আমরা সেই ছিটগ্রস্ত মানুষকে আরেকবার দেখেছি। তনয়বাবুর সঙ্গে সঙ্গে শান্তিনিকেতনের এক যুগ শেষ হয়েছে।

জগদানন্দবাবু এককালে বিদ্যালয়ের এবং আশ্রমের সর্বাধ্যক্ষরূপে কাজ করেছেন। সে কাজ কী অপূর্ব নিষ্ঠার সঙ্গে সম্পন্ন করেছেন তার অকুণ্ঠ স্বীকৃতি আছে রবীন্দ্রনাথের চিঠিতে। শান্তিনিকেতনে তখন নির্বাচনের দ্বারা অধ্যক্ষ নিযুক্ত হতেন। বিদ্যালয় পরিচালনার ভার তাঁর উপর ছেড়ে দিয়ে গুরুদেব কতখানি নিশ্চিন্ত ছিলেন তার প্রমাণ

সেই চিঠিটিতে। লিখেছেন, "আগামী ৭ই পৌষে পুনরায় তোমার রাজ্যাভিষেক হয় এইটি আমার ইচ্ছা।" আশ্রমবাসী সকলের মুখে তাঁর জয়ধ্বনি শোনা যেত। সেই জয়ধ্বনি আজও তাঁর প্রাক্তন ছাত্রদের মুখে মুখে প্রচারিত। আমার এই লেখা তারই প্রতিধ্বনি।

১৩৭৬

জগদানন্দ রায়

জন্ম ৩ আশ্বিন ১২৭৬ ● মৃত্যু ১১ আষাঢ় ১৩৪০

অধ্যাপক জগদানন্দ রায় বাংলার পাঠকসমাজে সাহিত্যিক রূপেই পরিচিত। বর্তমান শতাব্দের প্রথম তিন দশকে বাংলার কিশোর এবং অবৈজ্ঞানিক জনসাধারণ প্রধানতঃ তাঁরই প্রসাদে বিজ্ঞানের বিচিত্র রাজ্যের দেউড়িতে প্রবেশের ছাড়পত্র পেয়েছিল। কিন্তু তাঁর কর্মক্ষেত্র ছিল শান্তিনিকেতন। এখানে রবীন্দ্রনাথ-প্রতিষ্ঠিত ব্রহ্মবিদ্যালয়ে প্রথম চার-পাঁচজন অধ্যাপকের অন্যতম তিনি — নিরবচ্ছিন্নভাবে তিনিই এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে শেষ পর্যন্ত কর্মসূত্রে নিজেকে যুক্ত রেখেছিলেন। বিদ্যালয়ের জন্মক্ষণ থেকে শুরু করে তার বিশ্বভারতীতে পরিণতির বৈচিত্র্যময় জীবনে জগদানন্দ দীর্ঘকাল যে বিশিষ্ট ভূমিকা গ্রহণ করে গিয়েছেন তার সম্পূর্ণ ইতিহাস অল্প লোকেই জানেন।

এখন থেকে একশো বৎসর পূর্বে, ১২৭৬ বঙ্গাব্দের ৩রা আশ্বিন, কৃষ্ণনগরের রায়পাড়া পল্লীতে জগদানন্দ জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা অভয়ানন্দ রায় নদীয়ারাজের আত্মীয়, জমিদার-বংশের সন্তান। অভয়ানন্দের পূর্বপুরুষ চন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায় ছিলেন মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্রের ভগিনী যজ্ঞেশ্বরী দেবীর স্বামী। কৃষ্ণনগরেই জগদানন্দ তাঁর শিক্ষা সমাপ্ত করেন। কৃষ্ণনগর কলেজ থেকে ১৮৯২ খ্রীস্টাব্দে তিনি বি. এ. পরীক্ষা দিয়েছিলেন। সে সময় বিজ্ঞানের কোনো পৃথক ডিগ্রি ছিল না। কলেজে পাঠকালেই, মাত্র বাইশ বৎসর বয়সে, বাংলা ভাষায় বৈজ্ঞানিক প্রসঙ্গের আলোচনা করে বিভিন্ন সাময়িক পত্রিকায় জগদানন্দ প্রবন্ধ লিখতে শুরু করেন। সাধনা পত্রিকাতেও তাঁর প্রবন্ধ প্রকাশিত হত। এই সূত্রেই পত্রিকা-সম্পাদক রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে তিনি পরিচিত হন।

রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে প্রথম পরিচয়কালে জগদানন্দ এক পারিবারিক বিপর্যয়ে বিব্রত। অল্পকাল পূর্বে তাঁর পিতার মৃত্যু হয়েছে। পিতা

অভয়ানন্দ ছিলেন দিলদরিয়া মেজাজের মানুষ। আয়ের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে ব্যয়কে সীমিত করা তাঁর স্বভাবে ছিল না। জীবনকালেই তিনি তাঁর পৈতৃক সম্পত্তি নিঃশেষ করে দিয়েছিলেন। মৃত্যুকালে শুধু রেখে গেলেন এক বৃহৎ পরিবার। তাই উপার্জনের চেষ্টায় পুত্রদের, বিশেষ করে জ্যেষ্ঠ পুত্র জগদানন্দকে বেরিয়ে পড়তে হল। প্রথমে তিনি গোয়াড়িতে এক মিশনারি স্কুলে সামান্য একটি শিক্ষকতার কাজ গ্রহণ করলেন। কিন্তু তাতে পরিবারের আর্থিক সমস্যার বিশেষ কোনো সুরাহা হল না। রবীন্দ্রনাথ লিখছেন—'একদিন যখন জগদানন্দের সঙ্গে পরিচয় হল তখন তাঁর দুঃস্থ অবস্থা এবং শরীর রুগ্ন। আমি তখন শিলাইদহে বিষয়কর্মে রত। সাহায্য করবার অভিপ্রায়ে তাঁকে জমিদারি কর্মে আহ্বান করলেম।' কিন্তু রবীন্দ্রনাথ বুঝেছিলেন জমিদারি সেরেস্তা জগদানন্দের উপযুক্ত কর্মক্ষেত্র নয়। তাই নিজের পুত্রকন্যার শিক্ষার জন্য শিলাইদহ কাছারিতে তাঁর যে গৃহবিদ্যালয় ছিল জগদানন্দকে সেই বিদ্যালয়ে সেরেস্তার কাজের অবসরে শিক্ষকতার কাজেও লাগিয়ে দিলেন। এর কিছুদিন পর বোলপুরের আশ্রমে একটি আবাসিক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার অনুমতি পিতার নিকট পেয়ে রবীন্দ্রনাথ শিলাইদহের স্থায়ী বাস তুলে দিয়ে শান্তিনিকেতনে চলে এলেন। এই সময় জগদানন্দ জমিদারিতে বারবার ম্যালেরিয়া রোগে আক্রান্ত হয়ে মরণাপন্ন। এই অবস্থায় রবীন্দ্রনাথ তাঁকে শান্তিনিকেতনে অধ্যাপনার কাজে আহ্বান করে নিলেন।

১৩০৮ সনের শ্রাবণ মাসে জগদানন্দ বোলপুরে এলেন। ব্রহ্মবিদ্যালয় তখনো আনুষ্ঠানিকভাবে প্রতিষ্ঠিত হয় নি, তার উদ্যোগ চলছে। শুধু রথীন্দ্রনাথ পিতার সঙ্গে শান্তিনিকেতনে এসেছেন। আর জগদানন্দের পূর্বেই এসে পৌঁচেছেন শিলাইদহ গৃহবিদ্যালয়ের আর একজন শিক্ষক, শিবধন বিদ্যার্ণব। তখন বাড়িঘরের মধ্যে ছিল মহর্ষির নিজের এবং

আশ্রমের অতিথিগণের জন্য নির্মিত 'শান্তিনিকেতন' বাড়িটি এবং তার উত্তর-পশ্চিমে অবস্থিত একটি ছোট বাড়ি, সেটি ছিল ভৃত্যদের বাসগৃহ। আর ছিল বর্তমান গ্রন্থাগারের সিঁড়ির সম্মুখের ঘরখানা এবং তার দুই প্রান্তে দুটি কুঠরি—ছোট একটি একতলা এবং অসম্পূর্ণ বাড়ি। জগদানন্দ এবং বিদ্যার্ণব মহাশয় আশ্রয় পেলেন এর পশ্চিম-প্রান্তের কুঠরিটিতে। শান্তিনিকেতনে আসার প্রথম কয়েক মাস তাঁদের অধ্যাপনার কাজ বিশেষ ছিল না। জগদানন্দ রথীন্দ্রনাথকে কিছুক্ষণ গণিত ও বিজ্ঞান শিক্ষা দিতেন, আর বিদ্যার্ণব মহাশয় পড়াতেন সংস্কৃত।

১৯০১ খ্রীস্টাব্দের ২২শে ডিসেম্বর, ১৩০৮ সনের ৭ই পৌষ, আনুষ্ঠানিকভাবে বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হল। বর্তমান গ্রন্থাগারের পূর্ববর্ণিত মাঝের 'হল'-ঘরে এই উপলক্ষে সভা অনুষ্ঠিত হল। রথীন্দ্রনাথ, সুধীরকুমার নান, গিরীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য, গৌরগোবিন্দ গুপ্ত এবং প্রেমকুমার গুপ্ত—এই পাঁচটি বালক রক্তক্ষৌম বস্ত্র ও উত্তরীয় পরিধান করে ব্রহ্মচারীর বেশে রবীন্দ্রনাথের নিকট ব্রহ্মবিদ্যালয়ের ছাত্ররূপে দীক্ষা গ্রহণ করল। জগদানন্দ এবং বিদ্যার্ণব মহাশয় তসরের ধুতিচাদর পরিধান করে এই ব্রহ্মচারীদের নিকটেই আসন গ্রহণ করলেন। জন্মক্ষণে বিদ্যালয়ের জীবনের সঙ্গে জগদানন্দের হৃদয়ের এই যে যোগ স্থাপিত হল তার গ্রন্থি কোনোদিনই আর শিথিল হল না। বিদ্যালয়ের আশা-আকাঙ্ক্ষা, তার বিচিত্র উদ্যোগ, তার আনন্দ-বিষাদ সব-কিছুর সঙ্গে তিনি একাত্ম হয়ে গেলেন। বিদ্যালয় কখনো আয়তনে বাড়ল, কখনো বা সাময়িকভাবে সংকুচিত হল; অর্থাভাব কখনো এর অস্তিত্বকেই বিপন্ন করে তুলল। কখনো আভ্যন্তরীণ সংঘাতের ভূকম্পনে সমস্ত ব্যবস্থা বিপর্যস্ত হল। কত নূতন নূতন অধ্যাপক এলেন, আবার বিদ্যালয় ত্যাগ করে চলেও গেলেন। কিন্তু জগদানন্দ কোনো কারণে

কখনো সাময়িকভাবেও বিদ্যালয় থেকে নিজেকে দূরে সরিয়ে নিলেন না।

ব্রহ্মচর্যাশ্রম বিদ্যালয়ে জগদানন্দ ছিলেন বিজ্ঞান ও গণিতের শিক্ষক। বিজ্ঞান তাঁর প্রিয় বিষয়। 'শুক্রভ্রমণ' প্রবন্ধে তিনি বলছেন, 'বাল্যকাল হইতে বিজ্ঞানচর্চ্চায় আমার বড় আমোদ, এজন্য বহু চেষ্টায় কতকগুলি বিজ্ঞানগ্রন্থ এবং পুরাতনদ্রব্য-বিক্রেতার দোকান হইতে দুই চারিটি জীর্ণ বৈজ্ঞানিক যন্ত্রও সংগ্রহ করিয়াছিলাম। একটি ভগ্ন-পরকলা দাগী হাত-দূরবীণ, একটি ক্ষুদ্র আনিরয়েড্ ব্যারোমিটার, এবং দুইটি ছোট বড় তাপমানযন্ত্র আমার বৈজ্ঞানিক গবেষণার অবলম্বন ছিল ; এতদ্ব্যতীত একটি তন্ত্রীহীন বৈদ্যুতিক ঘণ্টা, কয়েকটি কাচের নল, একটি সচ্ছিদ্র ইন্‌কান্‌ডেসাণ্ট বৈদ্যুতিক দীপ, একটি বুন্‌সেনের সেল্ এবং কয়েক হাত রেশম-মোড়া তার ইত্যাদিও সংগ্রহ ছিল। আমার একটি বিজ্ঞানানুরাগী বন্ধুর সাহায্যে অবকাশকাল সুখেই কাটিত।' আবার, তাঁর এক ভ্রাতা সংবাদ দিচ্ছেন যে তরুণ বয়সে জগদানন্দ নিজেদের বাড়ির একটি ঘরে বৃহৎ খাঁচার মধ্যে নানা রকম পশুপাখি ও পোকা মাকড় সংগ্রহ করে তাদের আচার-আচরণ নিরীক্ষণ করতেন।

রবীন্দ্রনাথ তাঁর বিদ্যালয়ের পাঠ্যসূচীতে প্রকৃতি-পর্যবেক্ষণ এবং বিজ্ঞানশিক্ষা সম্পর্কে বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছিলেন। প্রকৃতি-পর্যবেক্ষণের সুযোগ শান্তিনিকেতনের প্রান্তরে যথেষ্টই ছিল। কিন্তু মনে রাখবার কথা এই যে, ষাট-পঁয়ষট্টি বৎসর পূর্বে যখন ভারতবর্ষে কলেজগুলিতেও সর্বত্র উপযুক্ত ল্যাবরেটরি দুর্লভ, রবীন্দ্রনাথ তখন আশ্রম-বিদ্যালয়ে তার ব্যবস্থা করেছেন। সর্বাধ্যক্ষ জগদানন্দ বিদ্যালয়ের ১৩১৯ সনের বার্ষিক প্রতিবেদনে সংবাদ দিচ্ছেন—'আশ্রমে একটি ক্ষুদ্র বীক্ষণাগার (laboratory) আছে। তাহাতে যে জিনিসপত্র আছে তাহার দ্বারা সামান্য পরীক্ষা চলে। পদার্থবিদ্যা ও রসায়ন-বিদ্যা শিক্ষার

যৎকিঞ্চিৎ সরঞ্জাম আছে। তাহা ছাড়া একটি দূরবীক্ষণ, অণুবীক্ষণ ও রশ্মিনির্ব্বাচনযন্ত্র (spectroscope) আছে।' এই 'ক্ষুদ্র' ল্যাবরেটরিতে বিজ্ঞানানুরাগী জগদানন্দের সম্পূর্ণ তৃপ্তি না হলেও এর সাহায্যে তিনি তাঁর ছাত্রদের মনে বিজ্ঞান সম্বন্ধে যে কৌতুহল, যে ঔৎসুক্য এবং আগ্রহের সৃষ্টি করতে পেরেছিলেন সমসাময়িক বাংলার স্কুল-স্তরের শিক্ষায় সম্ভবতঃ তা অভূতপূর্ব। 'পিতৃস্মৃতি' গ্রন্থে রথীন্দ্রনাথ তাঁর বিজ্ঞানশিক্ষক সম্বন্ধে লিখছেন—'সবচেয়ে ভাল লাগত যখন জগদানন্দবাবু বিজ্ঞান পড়াতেন।...গল্পচ্ছলে বিজ্ঞানের কথা বলার আশ্চর্য ক্ষমতা ছিল জগদানন্দবাবুর। তারপর যখন যন্ত্রের সাহায্যে কোনো পরীক্ষা দেখাতেন তখন আমরা মুগ্ধ হয়ে সেই দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকতুম। প্রশ্নের পর প্রশ্ন করতুম, আমাদের কৌতুহল যতই অবান্তর হোক না, তিনি বিরক্ত হতেন না; হাসিমুখে সব জবাব দিতেন। হুগলিতে এক ভদ্রলোক নিজের হাতে টেলিস্কোপ তৈরি করেছেন শুনে বাবা তাঁর কাছ থেকে একটি তিন ইঞ্চি টেলিস্কোপ তিনশো টাকা দিয়ে কিনে জগদানন্দবাবুকে দিলেন। এটি তাঁর খেলার জিনিস হল। রাত হলেই তিনি টেলিস্কোপটি নিয়ে বসে থাকতেন, কোনো গ্রহনক্ষত্র দেখতে পেলেই আমাদের ডেকে তা দেখাতেন।' এই টেলিস্কোপের সাহায্যে তিনি ছাত্র ও অধ্যাপকদের সকলকে হ্যালির ধূমকেতু দেখিয়েছিলেন। 'তাঁর বিজ্ঞানের ভাণ্ডার খোলা ছিল ছাত্রদের সম্মুখে যদিও তা তাদের পাঠ্য বিষয়ের অন্তর্গত ছিল না।'—রবীন্দ্রনাথের এই উক্তির মধ্যেই আমরা বিজ্ঞানশিক্ষক জগদানন্দের প্রকৃত রূপটির পরিচয় পাই।

সে সময় বিদ্যালয়ের ছাত্রদের মধ্যে প্রকৃতিপর্যবেক্ষণের ঔৎসুক্য এবং উৎসাহ যে কত ব্যাপক, কত প্রবল হয়ে উঠেছিল তার পরিচয় পাওয়া যাবে ১৩১৮, ১৩১৯ এবং ১৩২০ সনের তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার পাতা ওল্টালে। এই তিন বৎসর পত্রিকাটি রবীন্দ্রনাথের সম্পাদনায়

শান্তিনিকেতন থেকে প্রকাশিত হয়েছিল। এই তিন বৎসর প্রায় প্রতিসংখ্যায় আশ্রমবালকদের প্রকৃতিপর্যবেক্ষণের বিবরণ পত্রিকায় নিয়মিতভাবে প্রকাশিত হয়েছে। আশ্রমবিদ্যালয়ে ছাত্রদের মধ্যে প্রকৃতিপর্যবেক্ষণের এই উৎসাহের মূলে ছিলেন জগদানন্দ এবং তাঁর দ্বারা অনুপ্রাণিত কয়েকজন সহকর্মী।

শেষ জীবনে আমরা জগদানন্দকে বিদ্যালয়ে শুধু গণিত শিক্ষা দিতেই দেখেছি। রবীন্দ্রনাথ বলছেন, 'তাঁর ক্লাসে গণিত শিক্ষায় কোনো ছাত্র কিছুমাত্র পিছিয়ে পড়ে পরীক্ষায় যদি অকৃতার্থ হত সে তাঁকে অত্যন্ত আঘাত করত।' এ কথা সকলেই মানেন যে গণিত এমন একটি বিষয় যার সীমান্তপ্রদেশ অতিক্রম করে অধিকদূর অগ্রসর হওয়া অনেকের পক্ষেই একান্ত ক্লেশকর ব্যাপার, এমনকি অসম্ভব বললেই হয়। কিন্তু মুখে কোনো কোনো ছাত্রকে 'আঁক কষার' দুরাশা ত্যাগ করে 'গোরু চরাবার' উপদেশ দিয়ে ভৎর্সনা যতই করুন, এই সত্যটিকে গণিতশিক্ষক জগদানন্দ যেন অন্তর থেকে কিছুতেই স্বীকার করতে চাইতেন না। ক্লাসে প্রত্যেক ছাত্রের উপর দৃষ্টি রাখতেন। যারা কাঁচা তাদের দিয়েও সমস্ত কাজ করিয়ে নেবার চেষ্টা করতেন। ক্লাসের মধ্যেই সেটা সম্ভব না হলে ক্লাসের বাইরেও ছেলেদের ডেকে ডেকে সাহায্য করতেন। বহুদিন পর্যন্ত বিদ্যালয়ে প্রবেশিকা-পরীক্ষার্থী ছাত্রদের পূজার ছুটিতে বাড়ি যেতে দেওয়া হত না। পূজার কয়েকটা দিন পার হয়ে গেলেই তারা বিভিন্ন বিষয়ের অধ্যাপকের কাছে নিয়মিত পড়াশোনা শুরু করে দিত। বৃদ্ধ বয়সে, অবসর গ্রহণের মুখে শরীর যখন রোগে জীর্ণ তখনো মাস্টারমশায়কে আমরা ছুটির মধ্যে নিজের অবকাশ নষ্ট করে প্রসন্নমনে ছাত্রদের জন্য সময় দিতে দেখেছি।

শিক্ষার উচ্চ আদর্শ রক্ষার জন্য জগদানন্দের অক্লান্ত চেষ্টা ছিল। এজন্য তিনি যেমন নিজেকে রেহাই দিতেন না, তেমনি ছাত্রছাত্রীদের

কাছ থেকেও পূর্ণ মনোযোগ, অধ্যবসায় ও কঠোর শ্রম দাবি করতেন। তাঁকে সব ছেলেই ভয় করত। মাস্টারমশায়ের ক্লাসের কাজ ফেলে রাখতে বা না করে ক্লাসে যেতে সকলেই অস্বস্তি বোধ করত। একই কারণে বিদ্যালয়ের কোনো ব্যবস্থায় ছেলেমেয়েদের পড়াশোনার ব্যাঘাত সৃষ্টি হচ্ছে মনে করলে তিনি অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হতেন। এই ক্ষোভ তাঁকে যে কত গভীরভাবে বিচলিত করত তা বিদ্যালয়ের একজন প্রাক্তন ছাত্রের বর্ণিত একটি ঘটনা থেকেই স্পষ্ট বোঝা যাবে। জগদানন্দ একদিন গণিতের একটি ক্লাস করছেন এমন সময় রবীন্দ্রনাথের ভৃত্য এসে ক্লাসের কয়েকটি ছেলের নাম করে জানাল যে বাবুমশায় নাটকের মহড়ার জন্য এদের ডেকে পাঠিয়েছেন। জগদানন্দ অত্যন্ত বিরক্ত হলেন, ভৃত্যকে ধমক দিয়ে বললেন, 'যখন তখন রিহার্সল নিলেই হল? যা, বাবুমশায়কে গিয়ে বল, ছেলেরা ক্লাস করছে, এখন রিহার্সলে যেতে পারবে না।' ভৃত্য ফিরে গিয়ে এ কথা প্রভুকে জানালে রবীন্দ্রনাথ সমবেত অন্যান্য ছেলেদের বললেন, 'ওরে, ব্রাহ্মণ ভয়ানক চটেছে, তোরা যা, এখন আর রিহার্সল হবে না, পরে ডাকব।'

সাধারণভাবে ক্লাসের সব ছাত্রছাত্রীদের কাছে যেমন পাঠে মনোযোগ ও চেষ্টার দাবি করতেন তেমনি গণিতে যার ক্ষমতা যতটুকু বলে তিনি বুঝতেন পৃথকভাবে তার কাছ থেকে তদনুরূপ কাজের প্রত্যাশাও করতেন। সেটুকু না পেলে তাঁর দুঃখ হত, ক্ষোভ হত। আমাদের জানা একটি ঘটনার উল্লেখ এখানে প্রাসঙ্গিক হবে। বিশেষ কারণে একটি ছাত্র একদিন ক্লাসে অনুপস্থিত ছিল। পরের দিন জ্যামিতির ক্লাস, সেদিন যা পড়ানো হয়েছে মাস্টারমশায় তা লিখতে দেবেন, ছেলেটি জানে। তাই তার এক সতীর্থকে জিজ্ঞাসা করে পড়া তৈরি করে ক্লাসে গেল। যথারীতি মাস্টার মশায় লিখতে বললেন। সকলে লিখতে শুরু করল। দুতিন মিনিট পর মাস্টারমশায় জিজ্ঞাসা করলেন, 'কি হে,

তোমাদের হল ?' কোন জবাব নেই, সবাই ঘাড় গুঁজে লিখছে। একটু পর মাস্টারমশায় আবার সেই একই প্রশ্ন করলেন। কিন্তু তখনো সকলে অখণ্ড মনোযোগে খাতার উপর সমানে পেন্সিল চালিয়ে যাচ্ছে। হঠাৎ একসময় মাস্টারমশায় বলে উঠলেন, 'কি হে বিজ্ঞ, তুমি ওখানে বসে এতক্ষণ ধরে কিসের গবেষণা করছ ?' আর সঙ্গে সঙ্গে চকের বড় এক টুকরো এসে আমাদের এই ছেলেটির কপালে আঘাত করল! ব্যাপার এই যে, মাস্টারমশায় পূর্বদিন যা বুঝিয়েছেন সেটা খুবই সহজ এবং ছোট একটা জিনিস, লিখতে দুতিন মিনিটের বেশি সময় লাগার কথা নয়। কিন্তু আমাদের এই ছেলেটির সতীর্থ একটু রহস্য করার জন্যই হোক বা অন্য-মনস্ক ভাবেই হোক যা তাকে দেখিয়েছে সেটা একটা বড় জিনিস, লেখা সময়সাপেক্ষ। মাস্টারমশায় তো আর তা জানেন না, তাঁর ধারণামত অস্বাভাবিক দেরি দেখে ছেলেটির উপর এতই বিরক্ত হয়েছেন যে তাঁর ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটেছে!

ক্লাসের সীমার মধ্যেই বিদ্যালয়ের ছাত্রদের সঙ্গে জগদানন্দের যোগ সমাপ্ত হত না। রবীন্দ্রনাথ লিখছেন, 'সন্ধ্যার সময় ছাত্রদের নিয়ে তিনি গল্প বলতেন। মনোজ্ঞ করে গল্প বলবার ক্ষমতা তাঁর ছিল। তিনি ছিলেন যথার্থ হাস্যরসিক, হাসাতে জানতেন। তাঁর তর্জনের মধ্যেও লুকানো থাকত হাসি। সমস্ত দিনের কর্মের পর ছেলেদের ভার গ্রহণ করা সহজ নয়। কিন্তু তিনি তাঁর নির্দিষ্ট কর্তব্যের সীমানা অতিক্রম করে স্বেচ্ছায় স্নেহে নিজেকে সম্পূর্ণ দান করতেন।'

প্রথম দর্শনে বিদ্যালয়ের ছাত্রেরা তাঁর যে রূপটি প্রত্যক্ষ করত জগদানন্দের প্রাক্তন ছাত্র শ্রীনির্মলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় সেটি জীবন্তভাবে চিত্রিত করেছেন—'খড়্গাকৃতি বক্রনাসা, চোখে মোটা কাঁচের চশমা, ঈষৎ চাপা দুই ঠোঁট, বিরক্তিপূর্ণ ভ্রূভঙ্গি, এবং মোটা কম্বলের মত এক গরম চাদর মুড়ি দিয়া বসিবার ভঙ্গী— এই সমস্ত মিলিয়া বালকপ্রাণে যে অনুভূতির

উদ্রেক হইয়াছিল তাহা নিতান্ত ভয়ংকর।' কিন্তু এই ভীতি জগদানন্দের থেকে বিদ্যালয়ের তরুণ শিক্ষার্থীদের হৃদয়ের ব্যবধান সৃষ্টি করতে পারে নি। তিনি যে যথার্থ স্নেহশীল ও হিতৈষী তা বুঝতে কারো বেশিদিন সময় লাগত না। নির্মলচন্দ্র তাঁর সম্বন্ধে বিদ্যালয়ের সমস্ত ছাত্রের মনের কথা সুন্দরভাবে ব্যক্ত করেছেন—'মাস্টারমশায়ের প্রতি ভয় শান্তিনিকেতনে থাকিতে সম্পূর্ণ দূর কখনো হয় নাই। কিন্তু তাঁহার স্নেহের যে পরিচয় ক্রমশঃ পাইতে লাগিলাম তাহা পূর্বের অপরিচয়ের ভীতি অল্পদিনেই শ্রদ্ধায় পরিণত করিয়া দিল। ভয় ও ভালোবাসার সংমিশ্রণে তাঁহার সহিত…অপূর্ব সম্বন্ধের সৃষ্টি হইল।…জগদানন্দবাবু শান্তভাবে লোকচক্ষুর অন্তরালে বাস করিতে ভালোবাসিতেন…অথচ আশ্রম বালকদের সকল অভাব অনুযোগ ইত্যাদির খুঁটিনাটির তত্ত্বাবধানের ভিতর দিয়া এই দূরের মানুষটিই সকলের অন্তরের অতি কাছাকাছি বাসা বাঁধিয়াছিলেন।' শাস্তি উপলক্ষেও ছাত্রদের প্রতি লেশমাত্র নির্মমতা জগদানন্দ সহ্য করতে পারতেন না। শৃঙ্খলাভঙ্গের জন্য দণ্ড হিসাবে কোনো ছাত্রের এক বেলার আহার বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে সংবাদ পেয়ে জগদানন্দ নিজে অভুক্ত থেকেছেন এমন ঘটনা একাধিকবার ঘটেছে। আবার, আর-একজন ছাত্র-অধ্যাপক কৃতজ্ঞচিত্তে স্মরণ করছেন, একবার যখন ম্যালেরিয়া রোগে আক্রান্ত হয়ে তিনি বিদ্যালয়ের হাসপাতালে মরণাপন্ন, তখন জগদানন্দ যেরূপ অক্লান্তভাবে তাঁর শুশ্রূষা করেছিলেন তাতে এই রোগশয্যায় দূরবাসিনী মাতৃদেবীর সস্নেহ করস্পর্শই যেন তিনি অনুভব করেছিলেন। অনুরূপ ঘটনার সাক্ষ্য সেদিনের আরো অনেক ছাত্রই দিতে পারবেন। আশ্রমবালকেরা যে তাঁর হৃদয়ের কতখানি অধিকার করে বিরাজ করত তাঁর দুখানি গ্রন্থের পরপৃষ্ঠায় উদ্ধৃত উৎসর্গপত্র দুটি তার উজ্জ্বল স্বাক্ষর বহন করছে—

প্রকৃতি-পরিচয়ের উৎসর্গপত্র—

হে কল্যাণীয়

ব্রহ্মবিদ্যালয়ের ছাত্রগণ !

আশ্রমের সেই ক্ষুদ্র বীক্ষণাগারে অধ্যাপনাকালে তোমাদিগকে যে সকল কথা বলিয়াছি এবং শান্তস্নিগ্ধ কত সন্ধ্যায় আশ্রম-আঙিনায় বসিয়া তোমাদের নিকটে প্রকৃতির যে সকল রহস্য বিবৃত করিয়াছি, তাহাদেরি কতকগুলি আজ পুঁথির পাতায় আশ্রয় গ্রহণ করিল। আমার প্রবন্ধগুলি পুস্তকের আকারে প্রকাশিত দেখিতে তোমাদের আকাঙ্ক্ষা ছিল। এইজন্য তোমাদের মধ্যে যাহারা আশ্রমে আছ এবং যাহারা আশ্রম ত্যাগ করিয়া অন্যত্র অবস্থান করিতেছ, সকলেরি উদ্দেশে এই গ্রন্থখানি আমার অন্তরের আশীর্ব্বাদসহ উৎসর্গ করিলাম। তোমরা বিদ্যা ও জ্ঞানে দেশের সুসন্তান হও, ভগবানের নিকটে এই প্রার্থনা করিতেছি।

গ্রহ-নক্ষত্রের উৎসর্গপত্র—

যাদব,

যখন বইখানি লেখা হইতেছিল, তখন কতক অংশ পড়িয়া আশ্রম-বালকদের শুনাইয়াছিলাম ; ইহাতে তুমিই বেশি আনন্দ পাইয়াছিলে। যখন তুমি রোগশয্যায় শয়ান, বই ছাপা হইল কিনা, তখনো সন্ধান লইয়াছিলে। এখন তুমি পরলোকে ; বড়ই আক্ষেপ হইতেছে, ছাপা বই তোমার হাতে দিতে পারিলাম না। তাই আজ এখানি তোমার নামে উৎসর্গ করিলাম।

সত্যই এই 'শুষ্কদেহ, রুক্ষব্যবহার বৃদ্ধ শিক্ষকের অন্তরে জননীসুলভ গভীর স্নেহের এইরূপ গোপন সঞ্চয়' বিস্ময়কর। অথচ তাঁর এই স্নেহ অতিপ্রকট ছিল না। ছাত্রদের সঙ্গে তাঁর সম্বন্ধের প্রকৃত রূপটি রবীন্দ্রনাথের নিম্নে উদ্ধৃত উক্তিটিতেই যথার্থরূপে প্রকাশ পেয়েছে—'জগদানন্দ

একইকালে ছেলেদের সুহৃদ ছিলেন সঙ্গী ছিলেন, অথচ শিক্ষক ছিলেন অধিনায়ক ছিলেন—ছেলেরা আপনারাই তাঁর সম্মান রক্ষা করে চলত—নিয়মের অনুবর্তী হয়ে নয়, অন্তরের শ্রদ্ধা থেকে।'

শুধু অধ্যাপনা নয়, বিদ্যালয় পরিচালনার কাজেও জগদানন্দ প্রায় প্রথমাবধি যুক্ত ছিলেন। বিদ্যালয় পরিচালনার পূর্ব অভিজ্ঞতা রবীন্দ্রনাথের ছিল না। অধিকন্তু তাঁর পক্ষে দীর্ঘকাল স্থায়ীভাবে শান্তিনিকেতনে বাস করাও অসম্ভব ছিল। সূচনায় বিদ্যালয়ের সমস্ত ব্যাপারে ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায় মহাশয় তাঁর প্রধান সহায় ছিলেন। কিন্তু বিদ্যালয়ের জীবনের প্রথম বৎসরে, স্থাপনার কয়েক মাসের মধ্যেই উপাধ্যায় মহাশয় বিদ্যালয় ত্যাগ করে চলে গেলেন। এর অল্পকালের মধ্যে অসুস্থ পত্নীর চিকিৎসার জন্য দীর্ঘদিন রবীন্দ্রনাথ কলকাতায় বাস করতে বাধ্য হলেন। তাই বিদ্যালয় পরিচালনার জন্য তিনি এক অধ্যক্ষ-সমিতি নিযুক্ত করলেন। এই সমিতির সদস্য হলেন মনোরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়, জগদানন্দ রায় এবং সুবোধচন্দ্র মজুমদার, আর সম্পাদক কুঞ্জলাল ঘোষ। এ ব্যবস্থা অবশ্য দীর্ঘদিন স্থায়ী হল না। এর পর বিদ্যালয় পরিচালনার দায়িত্ব কখনো রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং গ্রহণ করেছেন, কখনো বা বিশেষ কোনো একজন অধ্যাপকের উপর ন্যস্ত করেছেন। বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের সঙ্গে প্রত্যক্ষ যোগ ছিন্ন করে রবীন্দ্রনাথ শান্তিনিকেতনে ফিরে এসে আর-একবার বিদ্যালয়ের শাসনব্যবস্থার পরিবর্তন সাধন করলেন। ছাত্র ও অধ্যাপক উভয়ের মধ্যেই স্বায়ত্ত-শাসনব্যবস্থা প্রবর্তিত হল। অধ্যাপকমণ্ডলীতে নির্বাচনপ্রথার প্রচলন হল। তাঁদের মধ্যে তিনজন অধিনায়ক নির্বাচিত হলেন। কিন্তু এই নূতন ব্যবস্থা প্রথমে তেমন দানা বাঁধল না। ১৯১০ খ্রীস্টাব্দে শাসনব্যবস্থার পুনর্বার সংস্কার সাধিত হল। বিদ্যালয় পরিচালনার জন্য 'সর্বাধ্যক্ষ' পদের সৃষ্টি হল। সর্বাধ্যক্ষ অধ্যাপকমণ্ডলী দ্বারাই নির্বাচিত, অন্য

শিক্ষকদের মত তিনি ও অধ্যাপনা করেন। শিক্ষা ব্যাপারে সাধারণভাবে দেখাশোনার ভার তাঁর উপর। তবে ছাত্রপরিচালনার প্রত্যক্ষ দায়িত্ব বিদ্যালয়ের আদ্য, মধ্য ও শিশু এই তিন বিভাগের অধ্যক্ষগণের। আর প্রত্যেক বিষয়ের শিক্ষার ব্যবস্থা এবং ছাত্রদের সেই বিষয়ে উন্নতি-অবনতি সম্বন্ধে লক্ষ্য রাখবার দায়িত্ব বিষয় পরিচালকগণের। প্রশাসনিক সমস্ত ব্যবস্থার দায়িত্ব সম্পূর্ণরূপে সর্বাধ্যক্ষের। কিন্তু এই অতিরিক্ত কাজের জন্য তিনি কোনো স্বতন্ত্র পারিশ্রমিক পান না। বিদ্যালয় পরিচালনার এই ব্যবস্থা চলে ১৯২২ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত। জগদানন্দ বিদ্যালয়ের প্রথম সর্বাধ্যক্ষ। আর এই পর্বে তিনিই অধিকাংশ সময় এই পদের দায়িত্ব বহন করেছেন। এই কাজে তাঁর নিষ্ঠা এবং দক্ষতার সাক্ষ্য স্বয়ং রবীন্দ্রনাথই রেখে গিয়েছেন। ১৩১৮ সনের চৈত্রমাসে রবীন্দ্রনাথের বিলাত যাওয়া স্থির হয়। যাত্রার আয়োজনে ব্যস্ত রবীন্দ্রনাথ এক পত্রে জগদানন্দকে লিখছেন, 'তোমাদের অধ্যাপকেরা আমাকে জাহাজে চড়াইয়া দিতে কেহ কেহ বোধ করি আসিবেন। কিন্তু তুমি যখন কর্ণধার তখন তোমার বিদ্যালয়তরীটি ফেলিয়া আসা তোমার দ্বারা হয়ত ঘটিবে না। অতএব দূর হইতেই তোমার নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ করিলাম। তোমার রাজত্বকালে বিদ্যালয় উন্নতিলাভ করিতে থাকুক। শাসনে তোমার শৈথিল্য নাই, অথচ তোমার শাসন ছেলে বুড়ো কাহারো অপ্রিয় নহে। এমন কি রাণাঘাটের……পর্য্যন্ত তোমার রাজ্যাভিষেকে আনন্দ প্রকাশ করিয়াছেন।' পরবর্তী বৎসর ১৩১৯ সনের ১লা অগ্রহায়ণ আমেরিকা থেকে একটি চিঠিতে তাঁকে লিখছেন, 'তোমাদের অধ্যক্ষ সভার কাছে আমার একটি নিবেদন, তোমাকে আগামী বারের জন্যও যেন সর্ব্বাধ্যক্ষ নিযুক্ত করেন। আমার প্রস্তাব এই যে এই পদটার ব্যাপ্তি অন্তত তিন বছর পর্য্যন্ত হয়—কারণ যন্ত্রটাকে আয়ত্তে নিতেই একটা বছর লাগে—তোমার হাতে খুব সুন্দর

কাজ হচ্ছিল একথা সকলকেই স্বীকার করতে হবে। আগামী ৭ই পৌষ তোমার রাজ্যাভিষেক হওয়া নিতান্ত আবশ্যক।' আমেরিকা থেকে লিখিত আর একখানি পত্রে, সম্ভবতঃ পূর্বোদ্ধৃত পত্রে বর্ণিত নির্বাচনের ফলাফল সম্বন্ধে সংবাদ পেয়ে লিখছেন, 'তুমি সর্ব্বাধ্যক্ষ পদে পুনর্ব্বার প্রতিষ্ঠিত হয়েছ এতে আমি বিশেষ আনন্দ বোধ করছি।'

বিশ্বভারতী প্রতিষ্ঠিত হলে তার সংবিধান অনুসারে বিদ্যালয়ের প্রশাসনব্যবস্থা পুনর্বিন্যস্ত হল। ব্রহ্মবিদ্যালয় সদ্যঃপ্রতিষ্ঠিত বিশ্বভারতীর সঙ্গে যুক্ত হয়ে তার অঙ্গরূপে পরিগণিত হল। নূতন সংবিধান অনুসারে শান্তিনিকেতনে অবস্থিত বিশ্বভারতীর সমস্ত বিভাগের পরিচালনের জন্য 'শান্তিনিকেতন-সমিতি' স্থাপিত হল। শান্তিনিকেতনের মুখ্যপ্রশাসক 'শান্তিনিকেতন-সচিব' পদের সৃষ্টি হল। এই পদের দায়িত্ব অনেকটা পূর্ববর্তী সর্বাধ্যক্ষ পদের অনুরূপ। বিদ্যালয়ের পরিবর্তিত পরিবেশে নূতন ব্যবস্থাকে স্থিতিদানের দায়িত্ব পড়ল জগদানন্দেরই উপর। ১৯২৩ খ্রীস্টাব্দে তিনি প্রথম 'শান্তিনিকেতন-সচিব' নির্বাচিত হলেন। কর্ম-জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত তিনি শান্তিনিকেতন-সমিতির সদস্য ছিলেন।

বস্তুত যখনই বিদ্যালয়ে বা পরবর্তীকালে বিশ্বভারতীতে নূতন কোনো কর্মের প্রবর্তন হয়েছে, অধিকাংশ ক্ষেত্রে সেই নূতন উদ্যোগের ভার গ্রহণ করে তার কর্মপ্রণালীকে সুনিয়ন্ত্রিত করার দায়িত্ব এসে পড়েছে জগদানন্দের উপর। ১৯২১ খ্রীস্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে বিশ্বভারতীর আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন হল। তার পর বিশ্বভারতী সংবিধান অনুসারে তার পরিষৎ ও সংসদ গঠিত হল। শান্তিনিকেতন ও শ্রীনিকেতন মিলিয়ে বিশ্বভারতীর সমগ্র কর্মপ্রচেষ্টার প্রশাসনিক প্রধানরূপে 'কর্মসচিব' পদের সৃষ্টি হল। ১৯২২ খ্রীস্টাব্দের প্রথম দিকে এই নূতন পদে প্রথম নিযুক্ত হলেন জগদানন্দ। রবীন্দ্রনাথের আমেরিকা বাস কালে লিঙ্কন শহরের অধিবাসীরা শান্তিনিকেতন বিদ্যালয়ের

বালকদের জন্য একটি মুদ্রাযন্ত্র উপহার দিয়েছিলেন। ১৯১৮ খ্রীস্টাব্দে সেটি শান্তিনিকেতনে স্থাপিত হল। জগদানন্দ প্রথম থেকেই এর কাজের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত হলেন। বিদ্যালয়ের ১৩২৫-২৬ সনের বিবরণে দেখি ব্যবস্থাপক সভার ছাপাখানার ভারপ্রাপ্ত সভ্য জগদানন্দ রায়। অনেকদিন পর্যন্ত তিনি ছাপাখানা পরিচালনার বিশেষ ভার বহন করেছেন। জীবনের শেষ ভাগে পর্যন্ত জগদানন্দ শান্তিনিকেতন প্রেসের 'মুদ্রাকর' ছিলেন। বিশ্বভারতীর প্রারম্ভিক উদ্যোগ পর্বে ১৩২৫ সনের শেষের দিকে রবীন্দ্রনাথের মনে শান্তিনিকেতনের মুখপত্ররূপে একটি পত্রিকা প্রকাশের ইচ্ছা হয়। পত্রিকার নাম হয় 'শান্তিনিকেতন পত্রিকা'। পত্রিকার উদ্দেশ্য সম্বন্ধে প্রথম সংখ্যায় সম্পাদক লিখছেন, 'এই কাগজে আমরা যাহা কিছু বলিব, তাহা কেবল আমাদের আশ্রমের ছাত্র ও আত্মীয় দিগকেই লক্ষ্য করিয়া বলিব। ...আমাদের আলাপ ঘরের লোকের আলাপ।' সেইজন্য পত্রিকাটির প্রচার প্রথম বৎসরে বিদ্যালয়ের বর্তমান ও প্রাক্তন ছাত্রছাত্রী, অধ্যাপক, কর্মী এবং বন্ধুদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ রাখা হয়। এই নূতন উদ্যোগটির দায়িত্ব অর্পিত হল জগদানন্দের উপর। তিনি 'শান্তিনিকেতন পত্রিকা'র প্রথম সম্পাদক নিযুক্ত হলেন। দ্বিতীয় বৎসরে পত্রিকার উদ্দেশ্য সম্প্রসারিত করে তাকে বিশ্বভারতীর মুখপত্র রূপে প্রকাশের ব্যবস্থা হল। তখন জগদানন্দ বিধুশেখর শাস্ত্রী মহাশয়ের সঙ্গে পত্রিকার যুগ্ম-সম্পাদকের দায়িত্ব গ্রহণ করলেন। তৃতীয় বৎসর থেকে 'শান্তিনিকেতন পত্রিকা' প্রকাশের দায়িত্ব আশ্রমের প্রাক্তন ছাত্র, অধ্যাপক ও কর্মীগণের প্রতিষ্ঠান 'আশ্রমিক সংঘ' গ্রহণ করলেন।

স্বদেশের দুর্গতি মোচনের পন্থা সম্বন্ধে তাঁর চিন্তাকে রবীন্দ্রনাথ এক সময় নিজেদের জমিদারিতে স্বল্প পরিধির মধ্যে রূপায়িত করবার চেষ্টা

করেছিলেন। দেশের মেরুদণ্ড পল্লীসমাজের সামগ্রিক উন্নতিকল্পে রচিত পল্লীসংগঠনের এই ধারাটিকে সুবিহিত কর্মপ্রণালীর যোগে ব্যাপকতর ক্ষেত্রে প্রয়োগের আকাঙ্ক্ষা রবীন্দ্রনাথের বরাবরই ছিল। বিশ্বভারতীর আরম্ভকালে এই উদ্দেশ্য সাধনে প্রধান সহায় রূপে পেলেন লেনার্ড এল্‌মহার্স্ট মহাশয়কে। তাঁর অর্থানুকূল্যে এবং তাঁরই ব্যক্তিগত পরিচালনায় বিশ্বভারতীর 'পল্লীসংগঠন বিভাগে'র সূত্রপাত হল ১৯২২ খ্রীস্টাব্দের ফেব্রুয়ারি মাসে। রবীন্দ্রনাথের পল্লীসংস্কার ও সংগঠনের মূলসূত্র হল গ্রামবাসীকে সংঘবদ্ধ করে স্বাবলম্বী করে তোলা, নিজেদের উন্নতির দায়িত্ব গ্রহণ করবার যোগ্য করে তোলা। পল্লীসংগঠন বিভাগের কর্মীরা গ্রামে কাজ করতে গিয়ে দেখলেন যে পল্লীগ্রামের সাধারণ মানুষ ঋণে আকণ্ঠ নিমজ্জিত। এই ঋণের দুঃসহ ভার লাঘব করতে না পারলে গ্রামের মানুষকে সংঘবদ্ধ করে আত্মবিশ্বাসে উদ্বুদ্ধ করে তোলার আশা সুদূর পরাহত। এই সমস্যা সম্বন্ধে বিশদ আলোচনা এবং সমাধানের উপায় চিন্তা করার জন্য রবীন্দ্রনাথের সভাপতিত্বে শ্রীনিকেতন ও শান্তিনিকেতনের প্রবীণ কর্মীদের এক সভা হল। জগদানন্দ এই সভার সকল আলোচনায় সক্রিয়ভাবে যোগ দিলেন। স্থির হল বিশ্বভারতীর পরিচালনাধীনে একটি সমবায় কেন্দ্রীয় কোষ স্থাপন করে তার সাহায্যে গ্রামবাসীদের নিয়ে বিভিন্ন ধরণের সমবায়-সমিতি গঠন করে এ সমস্যার সমাধান করতে হবে। সুতরাং সমবায়পদ্ধতিতে কেন্দ্রীয় কোষ স্থাপনের উদ্যোগ শুরু হল। জগদানন্দের বয়স তখন ষাটের কাছাকাছি, শরীরও তেমন সুস্থ নয়। কিন্তু উদ্যোগ-পর্বের সমস্ত চেষ্টার দায়িত্ব অনেকাংশে তাঁর উপরেই এসে পড়ল। ১৯২৭ খ্রীস্টাব্দে শান্তিনিকেতনে 'বিশ্বভারতী সমবায় কেন্দ্রীয় কোষ' স্থাপিত হল। জগদানন্দ হলেন ব্যাঙ্কের প্রথম সম্পাদক। কেন্দ্রীয় কোষ গ্রামের লোকের ঋণভার লাঘব করার উদ্দেশ্যে সমবায় প্রাথমিক

ঋণদান-সমিতি গঠন তো করলই, সমবায় স্বাস্থ্য সমিতি গঠন করল পল্লীবাসীর চিকিৎসা-সমস্যার সমাধান উদ্দেশ্যে, সমবায় ম্যালেরিয়া-নিবারণী সমিতি গঠন করে তখনকার এই কালব্যাধির কবল থেকে গ্রামবাসীকে রক্ষা করার চেষ্টা করল, চাষীর ক্ষেতের ফসল রক্ষার উদ্দেশ্যে তাদের সমবায় সেচসমিতি গঠনে উৎসাহ দিল, সমবায় শিল্প-সমিতি গঠন করে গ্রামের ধ্বংসোন্মুখ তাঁতি, কাঁসারি, গালার কারিগর-এদের রক্ষা করবার চেষ্টা করল; সমবায় মহিলা-শিল্পসমিতি গঠন করে অবসর সময় অর্থকর কোনো কাজে নিয়োগ করে তাঁদের সাংসারিক অবস্থার কিছু উন্নতির সুযোগ করে দিল। এ সকলের সঙ্গেই সম্পাদক হিসাবে জগদানন্দের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল। তিনি শুধু দপ্তরে বসে নির্দেশ দিয়েই তাঁর কর্তব্য সমাপ্ত করতেন না, মাঝে মাঝে গ্রামগুলিতে গিয়ে প্রাথমিক সমবায় সমিতিগুলির কাজকর্ম কিরকম চলছে দেখতেন, সমিতির কর্মকর্তাদের উৎসাহ দিতেন। ক্রমে বিশ্বভারতী সমবায় কেন্দ্রীয় কোষের কার্যক্ষেত্রের পরিধি প্রসারিত হল, ফলে সম্পাদকের কাজের পরিমাণও বাড়ল। উপরন্তু কেন্দ্রীয় কোষ স্থায়ীভাবে শান্তিনিকেতনে রাখা সম্ভব হয়ে উঠল না, তাকে শ্রীনিকেতনে স্থানান্তরিত করতে হল। এইসব নানা কারণে জগদানন্দের পক্ষে ১৯২৮ খ্রীস্টাব্দের পর কোষের দৈনন্দিন কার্যপরিচালনার দায়িত্ব বহন করা আর সম্ভবপর হয়ে উঠল না। কিন্তু তিনি ব্যাঙ্কের সঙ্গে সম্বন্ধ ছেদ করলেন না, ডিরেক্টর সভার অন্যতম সদস্য রয়ে গেলেন। কোষের সভ্যেরা তাঁকে ব্যাঙ্কের ডেপুটি চেয়ারম্যান নির্বাচিত করলেন। বিশ্বভারতীর কর্ম থেকে অবসর গ্রহণের দিন পর্যন্ত এই পদে অধিষ্ঠিত থেকে ব্যাঙ্কের নীতি নির্ধারণের মুখ্য দায়িত্ব তিনি বহন করে গিয়েছেন। কেন্দ্রীয় কোষের কাজ ছাড়াও বিভিন্ন সময়ে শ্রীনিকেতনের কর্মপ্রচেষ্টা ও তার প্রশাসন ব্যাপারে জগদানন্দ নানাভাবে দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন। শ্রীনিকেতনের কাজ নূতন নূতন ধারায় ক্রমশঃ

শান্তিনিকেতনে মাধবী-বিতানে জগদানন্দ রায়ের ক্লাস

বিস্তার লাভ করলে সেখানকার প্রশাসনিক ব্যবস্থা অনুসারে 'শ্রীনিকেতন-সমিতি' স্থাপিত হয়। ১৯২৫ খ্রীস্টাব্দে জগদানন্দ নবপ্রতিষ্ঠিত এই সমিতিতে শান্তিনিকেতন-সমিতির প্রতিনিধি নির্বাচিত হলেন। তারপর ১৯২৮ খ্রীস্টাব্দের প্রথম দিকে রথীন্দ্রনাথ ভগ্নস্বাস্থ্য পুনরুদ্ধার কল্পে দীর্ঘদিনের জন্য য়ুরোপবাসে বাধ্য হলে, তাঁর অনুপস্থিতি কালে জগদানন্দ শিক্ষাসত্রের তৎকালীন ডিরেক্টর ডক্টর প্রেমচাঁদ লালের সঙ্গে একযোগে যুগ্ম-শ্রীনিকেতন-সচিবের পদ গ্রহণ করে পল্লীসংগঠন বিভাগ পরিচালনার ভারও বহন করেছিলেন।

শান্তিনিকেতন বিদ্যালয়ে জগদানন্দের বিচিত্র কর্মোদ্যমের আর-একটা দিকের পরিচয়ও দেওয়া প্রয়োজন। পত্নী ও মধ্যমা কন্যার মৃত্যুর পর রবীন্দ্রনাথ 'শান্তিনিকেতন' বাড়িতে আর বাস করেন নি। আশ্রমের পূর্বপ্রান্তে নিজের জন্য 'দেহলি' আর পুত্রকন্যাদের বাসের জন্য তারই পাশে 'নতুন বাড়ি' নির্মাণ করেছিলেন। এই বাড়ির উত্তরে তাঁদের নিজেদের ব্যবহারের জন্য একটি কূপও খনন করেছিলেন। তারই পাশে রবীন্দ্রনাথের ফুল, ফল ও সবজি বাগান ছিল। পূর্বেই উল্লেখ করেছি, রবীন্দ্রনাথের পক্ষে স্থায়ীভাবে শান্তিনিকেতনে বাস করা সম্ভব ছিল না। সেজন্য এই বাগান তত্ত্বাবধানের ভার ছিল জগদানন্দের উপর। তখন বিদ্যালয়ের নিজস্ব কোনো বাগান ছিল না। ক্রমে রবীন্দ্রনাথের উৎসাহে বিদ্যালয়ের উদ্যোগ শুরু হল। তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার ১৩১৯ সনের কার্তিক সংখ্যার আশ্রম সংবাদে দেখি, 'যাহাতে একদল ছাত্র এক এক খণ্ড জমি লইয়া তাহাতে যত্নের সহিত শাকসবজি রোপণ করিতে পারেন তজ্জন্য চেষ্টা চলিতেছে।' আশ্রমের এই নূতন প্রচেষ্টার দায়িত্বও অনতিকাল মধ্যে জগদানন্দের উপর এসে পড়ল। এ কাজেও তাঁর উৎসাহ উদ্যম অফুরন্ত। আর তাঁর এই উৎসাহ ছাত্রদের অনেকের মধ্যে সংক্রামিত হতে বিলম্ব হল না। তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার ১৩২০

সনের অগ্রহায়ণ-পৌষ সংখ্যায় আশ্রমসংবাদ—'বিদ্যালয়ের কৃষিকার্য খুব উৎকর্ষ লাভ করিয়াছে। এবার বেগুন, কপি, আলু, ওলকপি, মটর, বীট ইত্যাদি বপন করা হইয়াছে। ছাত্রদিগের মধ্যে যাঁহাদের এ বিষয়ে আগ্রহ আছে, তাঁহারা বাগানের সেবা ও তত্ত্বাবধান যত্নপূর্বক করিতেছেন। কৃষিকার্য পরিদর্শনের ভার সর্বাধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত জগদানন্দ রায় মহাশয়ের উপর আছে।' আবার শান্তিনিকেতন পত্রিকার ১৩২৬ সনের অগ্রহায়ণ সংখ্যার আশ্রম-সংবাদে দেখি যন্ত্রশালার উত্তরে নূতন কূয়ার পাশে বিদ্যালয়ের যে বিস্তীর্ণ উদ্যান রচিত হয়েছে অধ্যাপক জগদানন্দ রায় মহাশয়ের তত্ত্বাবধানে তাতে নানারকম সবজি ও ফল উৎপন্ন হচ্ছে। এই স্থানেই অবসর গ্রহণের মাত্র এক বৎসর পূর্বে, ১৯৩১ সালেও তাঁকে আমরা মহা উৎসাহে বাগান করতে দেখেছি। তখন অবশ্য ছাত্রেরা তার সঙ্গে আর যুক্ত ছিল না, বাগানের জন্য মালী ছিল। কিন্তু মাস্টারমশায় প্রতিদিন ঘুরে ঘুরে সমস্ত দেখাশোনা করতেন, অনেক গাছ তিনি স্বহস্তে রোপণ করতেন। তখন বিদ্যালয়ের বাগানে শাকসবজি তো উৎপন্ন হতই, পেঁপে, আনারস এবং নানা জাতের কলাও ফলত। শীতের দিনে বড় কূয়ার পাড়ে নিজেদের থালাবাটি মাজতে গিয়ে মাস্টারমশায়ের বাগানে লাল রঙের বড় বড় টোমাটো দেখে আমাদের লোভ সংবরণ করা কঠিন হয়ে উঠত। সেগুলি আহৃত হয়ে বিদ্যালয়ের ভোজনশালায় আমাদেরই ব্যঞ্জনাদির স্বাদ বৃদ্ধি করবে এ কথা জেনেও অতক্ষণ ধৈর্য অবলম্বন করা আমাদের পক্ষে সম্ভব হত না।

গণিতের শিক্ষক, গম্ভীরপ্রকৃতি জগদানন্দ বন্ধু ও সতীর্থমহলে একজন সুরসিক ব্যক্তি বলেই পরিচিত ছিলেন। শিক্ষকমশায়ের কপট তর্জনের আড়ালেও অনেক সময় তাঁর নিঃশব্দ হাসিটি লুকানো থাকত। আর তা ছেলেদের সম্পূর্ণ অগোচরও ছিল না। তাঁকে সমীহ করত, কিন্তু তাঁকে নিয়ে আমোদ করতেও তারা ছাড়ত না। খাটের উপর বিশ্রামরত

জগদানন্দকে খাটসুদ্ধ মাথায় তুলে ছাত্র রথীন্দ্রনাথ ও তাঁর সঙ্গীদের হরিবোল দিতে দিতে ভুবনডাঙার বাঁধের জলে নামানোর গল্প অনেকেই শুনেছেন। তাঁর স্নিগ্ধ রসিকতার বহু গল্প ছাত্রমহলে প্রচলিত ছিল। এই রূপ এক রসিকতার বিবরণ দিয়েছেন তাঁর পূর্বোল্লিখিত ছাত্র নির্মলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। তিনি লিখছেন—"মাস্টারমহাশয় ডিটেকটিভের এক রোমাঞ্চকর গল্প একরাত্রে বলিতেছিলেন। তাঁহার বলার ভঙ্গীতে অভিভূত হইয়া সকলেই স্তব্ধ হইয়া শুনিতেছি। গল্পটি তিনি উত্তম পুরুষে বলিয়া চলিয়াছেন।...আমরা সকলেই গল্পটির প্রায় সমস্ত বিশ্বাস করিয়াছিলাম। এমন সময় কে একজন অসীমসাহসী জিজ্ঞাসা করিয়া বসিল: 'এ সব সত্যি মাস্টারমশাই?' কৃত্রিম ক্রোধের সহিত চোখ পাকাইয়া মাস্টারমহাশয় উত্তর করিলেন: 'সত্যি নয় তো আবার কি? তোমাদের কাছে কি এই বুড়ো বয়সে মিথ্যা কথা বলতে বসেছি?'

যে সব ছাত্র পরবর্তী কালে শান্তিনিকেতনে এসেছেন তাঁদের কাছে মাস্টারমশায়ের পরিচয় অসম্পূর্ণ থেকে গিয়েছে। তাঁকে রঙ্গমঞ্চে পাদপ্রদীপের আলোকে দেখবার সুযোগ তাঁদের কখনো হয়নি। তাঁর অভিনয়কুশলতার কাহিনী তখন কিংবদন্তীতে পরিণত। অভিনয়ে তাঁর উৎসাহ বালককাল থেকেই। বালকবয়সে পাড়ার ছেলেদের জুটিয়ে বাড়ির পূজাদালানে অভিনয় করতেন। শান্তিনিকেতনে বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার দুতিন বৎসরের মধ্যে এখানকার ছাত্র ও অধ্যাপকেরা মিলে Midsummer Night's Dream অভিনয় করেন। এটি এখানে তাঁর প্রথম অভিনয়। এই ঘটনা সম্বন্ধে স্বয়ং জগদানন্দ লিখছেন—'আমারো একটা ভূমিকা ছিল। সেক্সপিয়রের লেখা কবিতা মুখস্থ করিয়া অভিনয় করিতে হইবে। খুব মুখস্থ করিলাম। কিন্তু রঙ্গমঞ্চে দাঁড়াইয়া দেখি, সকল শ্রম পণ্ড হইয়াছে। যাহা মুখস্থ করিয়াছিলাম, তার এক ছত্রও মনে নাই। কিন্তু অভিনয় তো করিতে

হইবে—কাজেই যাহা মুখে আসিল, তাহা বলিয়া অভিনয় শেষ করিলাম। শ্রোতৃবর্গ এই নূতন অভিনয় দেখিয়া অবাক।' রবীন্দ্রনাথের রচিত নাটকে জগদানন্দ প্রথম অভিনয় করেন 'শারদোৎসবে', ১৯০৮ সালের আশ্বিন মাসে। তিনি অভিনয় করেছিলেন লক্ষেশ্বরের ভূমিকা। এই এক রাত্রেই তিনি বিদ্যালয়ের সমস্ত বালকের হৃদয় হরণ করে নিয়েছিলেন। একাধিকবার শান্তিনিকেতন এবং কলকাতায় তিনি এই ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছেন। রথীন্দ্রনাথ 'পিতৃস্মৃতি' গ্রন্থে লিখছেন—'কৃপণ লক্ষেশ্বরের ভূমিকায় তিনি যে কৃতিত্ব দেখিয়েছিলেন তা সত্যই অনন্য এবং অনবদ্য। মনে হত লক্ষেশ্বরের ওই ভূমিকাটুকু যেন জগদানন্দবাবুর জন্যই বিশেষভাবে লিখিত।' শারদোৎসবের পর রবীন্দ্রনাথের কয়েকটি নাটকেই তিনি বিভিন্ন সময়ে অভিনয় করেছেন। 'প্রায়শ্চিত্তে' চন্দ্রদ্বীপের রাজা প্রতাপাদিত্য-জামাতা রামচন্দ্র, 'রাজা'য় কোশলরাজ, 'অচলায়তনে' মহাপঞ্চক, 'ফাল্গুনী'তে দাদা—প্রধান-অপ্রধান যখন যে-ভূমিকায় তিনি অভিনয় করেছেন, দর্শকের সামনে চরিত্রটি জীবন্ত হয়ে উঠেছে। শান্তিনিকেতন বিদ্যালয়ের ঘরোয়া পরিবেশে কিম্বা কলকাতার সাধারণ রঙ্গমন্দিরে সহস্র চক্ষুর সম্মুখে, সর্ব অবস্থায় তিনি সমান সচ্ছন্দ ছিলেন।

শুধু অভিনয়কলা নয়, গীতকলাতেও তাঁর তুল্য আকর্ষণ আর অধিকার ছিল। এসরাজ এবং বেহালা তিনি ভালোই বাজাতেন। এ দুটি যন্ত্র ছিল প্রধানতঃ তাঁর নিভৃত অবসরের সঙ্গী। তবে শান্তিনিকেতনের ঘরোয়া আসরেও অনেক সময় তিনি বাজিয়েছেন। গান তিনি গাইতে পারতেন না, কিন্তু গানের ভক্ত ছিলেন। গানের আসরে বসে সুদূরে দৃষ্টি নিবদ্ধ করে তন্ময় হয়ে গান শুনতে অনেক সময়েই তাঁকে দেখা যেত। আবার রেখা, রূপ ও রঙের সৌন্দর্যও তাঁকে বিস্মিত করত। আচার্য নন্দলাল বসু স্মরণ করেছেন যখন তাঁরা গ্রন্থাগারের তৎকালীন পাঠকক্ষ, পশ্চিম প্রান্তের কুঠরিটির দেওয়ালে

চিত্রাঙ্কন করছিলেন জগদানন্দ প্রায়ই সেখানে গিয়ে বসতেন, তাঁদের কাজ উপভোগ করতেন।

জগদানন্দের সাহিত্য-কৃতি তো তাঁর জীবদ্দশাতেই দেশে স্বীকৃত হয়েছে। বিজ্ঞানের নানা শাখা ও নানা স্তরের জটিল তথ্যরাজি সহজ, সুন্দর ও চিত্তাকর্ষক বাংলায় দীর্ঘদিন ধরে দেশবাসীকে নিয়মিত উপহার দিয়ে সাধারণ মানুষের মধ্যে বিজ্ঞানের প্রচার তিনি করে গিয়েছেন। এ কাজ সেদিন সহজ ছিল না। তখন পর্যন্ত বাংলা ভাষায় বিজ্ঞানের আলোচনা সামান্যই হয়েছে। এ ভাষার শিশুসাহিত্যে তো সেদিন বিজ্ঞানের প্রবেশই নিষেধ ছিল বলা চলে। বিজ্ঞানের বিষয়বস্তু প্রকাশের উপযুক্ত ভাষা বহুলাংশে তাঁকে নিজেই সৃষ্টি করে নিতে হয়েছে। এজন্য তাঁকে প্রতি পদে বিজ্ঞান-আলোচনায় ব্যবহৃত অসংখ্য শব্দের পরিভাষা গঠন করতে হয়েছে। এ কাজে তিনি এমনই নৈপুণ্য দেখিয়েছেন যে তাঁর রচনাপাঠকালে পাঠকের কখনো মনেই হয় না শব্দগুলি অপরিচিত, এই প্রথম শুনছেন। প্রবন্ধ বা গ্রন্থ রচনাকালে জগদানন্দের লক্ষ্য ছিল প্রধানতঃ শিশুকুল। বিদ্যালয়ে গল্প বলে তিনি ছেলেদের মনোরঞ্জন করতেন—গোয়েন্দার গল্প, ভূতের গল্প, বিজ্ঞানের কল্পনা-রাজ্যের গল্প। বিজ্ঞানের ক্লাসে নানা জটিল তথ্য বোঝাতেন গল্পচ্ছলে। গ্রন্থরচনাকালেও তাঁর সেই একই প্রকৃতি—তিনি কথক, গল্পকার। পঞ্চাশ-একশোটির স্থানে সহস্র শিশু মনশ্চক্ষুর সমুখে তাঁকে ঘিরে গোল হয়ে বসে গিয়েছে, তাঁর গল্প শুনবে। দীর্ঘদিনের সাধনাতেই তিনি লিখিত ভাষায় তাঁর নিজস্ব স্টাইল, বিশিষ্ট ভঙ্গিটি আয়ত্ত করতে পেরে-ছিলেন। বৃদ্ধবয়সেও এই সাহিত্যসাধনায় তাঁর ক্লান্তি, বিরাম বা বিশ্রাম ছিল না। নূতন কোনো বই লিখলে তাঁর ছাত্রদের শুনিয়েছেন, জিজ্ঞাসা করেছেন—'বুঝতে পারলি তো? ভালো লাগল তো? বল্, না হয় আবার নতুন করে লিখব, আরো সহজ করে লিখব।' তাঁর লেখা যে

বাংলার শিশুদের ভালো লেগেছে তার প্রমাণ তাঁর জীবিতকালেই তাঁর বইয়ের একাধিক সংস্করণ মুদ্রিত হয়েছে। কোনো কোনো বইয়ের তো প্রথম প্রকাশের তিন-চার বৎসরের মধ্যেই দ্বিতীয় সংস্করণ মুদ্রণের প্রয়োজন ঘটেছে। মনে রাখতে হবে শিক্ষিত সমাজে সেকালে আজকার মত বই কেনার প্রচলন হয় নি। শিক্ষিত বাঙালী সমাজে তখনো ছেলেমেয়ের জন্মদিন একটা ঘরোয়া উৎসবের দিন হয়ে ওঠে নি এবং শিশু বা কিশোর মনের খোরাক জোগাবার উদ্দেশ্যে ওদের হাতে বৎসরে বৎসরে বিচিত্র গ্রন্থসম্ভার তুলে দেবার প্রয়োজনও অনুভূত হয় নি।

জীবনের শেষভাগে বিশ্বভারতীর বহু বিভাগের বিভিন্ন কর্মসূচীকে অতিক্রম করে জগদানন্দের কর্মক্ষেত্র শান্তিনিকেতনের পারিপার্শ্বিক অঞ্চলে এবং ক্রমশঃ সারা বীরভূম জেলাতেই প্রসারিত হয়েছিল। মৃত্যুর পূর্ব-পর্যন্ত বহু বৎসর তিনি বোলপুর ইউনিয়ন বোর্ডের সদস্য এবং বোলপুর ইউনিয়ন বেঞ্চ কোর্টের অনারারি ম্যাজিস্ট্রেট ছিলেন। জেলাশাসক তাঁকে লোকাল বোর্ডের সদস্য মনোনীত করেছিলেন। জনসেবার এই-সব নূতন কর্মক্ষেত্রেও তাঁর নিষ্ঠা, সততা ও হিতৈষণা সকলের শ্রদ্ধা এবং সম্ভ্রম আকর্ষণ করেছিল। বোলপুর এবং আশপাশের গ্রামাঞ্চলের সাধারণ মানুষ তাদের ব্যষ্টি বা গোষ্ঠী-জীবনের নানা সমস্যায় পরামর্শের প্রত্যাশায়, সহায়তার দাবিতে পরিপূর্ণ ভরসা নিয়ে তাঁর কাছে এসে দাঁড়াত।

জগদানন্দ চিরদিন সবল সরল অনাড়ম্বর জীবন যাপন করে গিয়েছেন। প্রথম জীবনে তাঁকে অভাব-অনটনের সঙ্গে সংগ্রাম করতে হয়েছে। তার পর জীবনের সায়াহ্নভাগে অপেক্ষাকৃত সচ্ছল অবস্থা তিনি লাভ করেছিলেন সন্দেহ নেই। অথচ তখনো তাঁর জীবনযাত্রার ধারায় কোনো পরিবর্তন ঘটে নি। পূর্বেই উল্লেখ করেছি জগদানন্দের সাংসারিক অভাব মোচনের জন্য রবীন্দ্রনাথ তাঁকে প্রথমে জমিদারির কাজে নিযুক্ত করেছিলেন। 'তার প্রধান কারণ জমিদারি দপ্তরে

বেতনের কৃপণতা ছিল না।' অথচ যৌবনেই বিপত্নীক, চারটি শিশুসন্তানের লালনপালনের সমস্যায় বিব্রত জগদানন্দই তাঁর আহ্বানে বিন্দুমাত্র দ্বিধা না করে অখ্যাত এবং অনিশ্চিত-ভবিষ্যৎ এক বিদ্যালয়ের অধ্যাপনার কাজ সানন্দে গ্রহণ করেছিলেন। জগদানন্দের নিজের ভাষাতেই তুলে দেওয়া যাক তাঁর জীবনের এই বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ সন্ধিক্ষণের বিবরণ—"আশ্রমে আসিবার পূর্বে যেদিন গুরুদেব আমাকে জোড়াসাঁকোর বাড়িতে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, 'তুমি জমিদারির কাজে থাকিতে চাও, না আমার সঙ্গে শান্তিনিকেতনে যাইতে চাও?' সেই দিনটা আমার জীবনের একটা স্মরণীয় দিন। আমি সানন্দে বলিয়া ফেলিলাম, 'আমি নায়েব হইতে চাহি না। আপনার সঙ্গে শান্তিনিকেতনেই যাইব।' গুরুদেব বলিলেন 'তথাস্তু'। হাতে স্বর্গ পাইলাম।" বৈষয়িকের কণ্ঠস্বর এ নয়। জ্ঞানের চর্চা, অধ্যয়ন-অধ্যাপনায় সহজ অনুরাগ এবং প্রবণতা এ তাঁর প্রকৃতিগত। এমন না হলে ভাবুকতা, কল্পনা, আদর্শের প্রতি অনুরাগ এ সকলই শান্তিনিকেতন বিদ্যালয়ের আরম্ভকালীন উপকরণবিরল কঠোর জীবনের রূঢ় বাস্তবের আঘাতে স্তিমিত হতে অধিক সময় লাগত না ; সেই অতিক্ষুদ্র প্রতিষ্ঠানের গুটিকয়েক ছাত্র ও দুচারজন সহকর্মীর সাহচর্যে সীমাবদ্ধ কাজের মধ্যে যথার্থ আনন্দের উপাদান ও সুদূর মহত্ত্বের সম্ভাবনা কখনোই খুঁজে পেতেন না।

যৌবনে ম্যালেরিয়া-রোগগ্রস্ত হয়ে জগদানন্দের স্বাস্থ্য নষ্ট হয়ে গিয়েছিল। জমিদারি কাজে নিযুক্ত জগদানন্দের শারীরিক অবস্থার কথা বর্ণনা করে রবীন্দ্রনাথ লিখছেন—'সেখানে তিনি বারবার জ্বরে আক্রান্ত হয়ে অত্যন্ত দুর্বল হয়ে পড়লেন। তাঁর অবস্থা দেখে মনে হল তাঁকে বাঁচানো শক্ত হবে।' জমিদারির কাজ ছেড়ে প্রথম যখন শান্তিনিকেতনে এলেন সে সময়ের কথা জগদানন্দ স্বয়ং বর্ণনা করছেন—

'তখন আমি ম্যালেরিয়া-রোগী। স্বাস্থ্য কাহাকে বলে জানিতাম না। বৎসরের মধ্যে দশমাস শয্যাগতই থাকিতাম। বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠে আম-কাঁঠাল খাইয়া একটু সুস্থ বোধ করিলে আষাঢ়ে ম্যালেরিয়া ধরিত, এবং তাহার জের ফাল্গুন-চৈত্রের পূর্বে শেষ হইত না।' আবার জীবনের শেষ ভাগেও রোগে, পারিবারিক নানা দুশ্চিন্তায় তাঁর শরীর জীর্ণ হয়ে গিয়েছিল। যেদিন তাঁর গৃহে তাঁরই জ্যেষ্ঠা দৌহিত্রীর বিবাহ, সেদিন ডাক্তারের নির্দেশে জগদানন্দ হাসপাতালে আবদ্ধ, পাছে অনুষ্ঠানের উত্তেজনায় তাঁর অস্বাভাবিক রক্তচাপ আরো বৃদ্ধি পেয়ে বিপদসীমা অতিক্রম করে যায়! মাঝে শান্তিনিকেতনে কর্মজীবনের প্রথম দিকে, তাঁর স্বাস্থ্যের কিছু উন্নতি হয়েছিল। কিন্তু শরীরের দিক থেকে কোনোদিনই তাঁকে সম্পূর্ণ সুস্থ বলিষ্ঠ পুরুষ বলা চলত না। এমন মানুষটি যে এত রকমের কাজ একই সঙ্গে দীর্ঘদিন ধরে এমন নিরলস-ভাবে চালিয়ে যাবার শক্তি কোথা থেকে আহরণ করতেন সে কথা ভাবলে অবাক হতে হয়। অদম্য মনোবলই তাঁর অক্লান্ত কর্মশক্তির যথার্থ উৎস ছিল।

দৃষ্টিভঙ্গীর দিক থেকে জগদানন্দ ছিলেন রক্ষণশীল। যুগের ধারা ধরণ, প্রবৃত্তি ও প্রকৃতি লক্ষ্য করে এই শব্দটি তাঁর সম্বন্ধে প্রয়োগ করতে অবশ্য সংকোচ হয়। তবু তাঁর মনের গঠন, তাঁর চরিত্র বা প্রকৃতি সম্ভবতঃ এই শব্দটির সাহায্যেই যথার্থভাবে বর্ণনা করা সম্ভব। পরিবর্তনের তিনি বিরোধী ছিলেন না। কিন্তু নূতনের পাদপীঠে নির্বিচারে পূজার অর্ঘ্য সাজিয়ে দিতে তাঁর মন চাইত না। কালের গতিকে রাষ্ট্রে ও সমাজে অনেক আবর্জনা নিয়তই জমতে থাকে, আর মাঝে মাঝে তা সরিয়ে ফেলতে না পারলে রাষ্ট্র বা সমাজের স্বাস্থ্যেরও হানি, এ কথা তিনি অস্বীকার করতেন না। কিন্তু অতীত থেকে যা কিছু আমরা উত্তরাধিকারসূত্রে পেয়েছি তার সবটাই আবর্জনা, সমস্তই নির্বিচারে

দূর করে না দিলে আমাদের মঙ্গল নেই—এ কথা তিনি মানতেন না। ফলতঃ গড়ার কাজেই ছিল তাঁর আগ্রহ এবং উৎসাহ, ভাঙার কাজে নয়। সেইজন্য রবীন্দ্রনাথের বিদেশবাসকালে অসহযোগ আন্দোলনের ঢেউ লেগে শান্তিনিকেতনের ছাত্র এবং অধ্যাপক সমাজকে যখন চঞ্চল করে তোলে, অধ্যাপকদের কয়েকজন যখন স্বাধীনতার জন্য জাতীয় সংগ্রামের সেই সন্ধিক্ষণে অধ্যয়ন-অধ্যাপনাতে নিজেদের আবদ্ধ রাখাকে দেশের প্রতি কর্তব্যচ্যুতি জ্ঞানে বিদ্যালয় ত্যাগ করে দেশের কাজে নিযুক্ত হন, যখন অধ্যাপকমণ্ডলীর অধিকাংশের প্রস্তাবানুসারে প্রাইভেট পরীক্ষার্থী হিসাবে বিদ্যালয়ের ছাত্রদের কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবেশিকা পরীক্ষায় পাঠানোর ব্যবস্থা রহিত হয়ে যায়, তখন জগদানন্দ এ সবের তীব্র বিরোধিতা করেছিলেন। অপরদিকে তাঁর মন ছিল বাস্তবাশ্রয়ী। সেই কারণেই গান্ধীজির প্রেরণা এবং উৎসাহে যখন অধ্যাপকমণ্ডলী বিদ্যালয়ের সমস্ত কাজই ছাত্র ও অধ্যাপক মিলে করবেন স্থির করে বিদ্যালয়ের পাচক ভৃত্য মালী মেথর সকলকে বিদায় দিয়েছিলেন, তখন সে ব্যবস্থাও জগদানন্দ অনুমোদন করেন নি।

জীবনের সায়াহ্নকালে জগদানন্দের বিচিত্র কর্মপ্রচেষ্টার কিঞ্চিৎ স্বীকৃতি দেশ ও রাষ্ট্র তাঁকে দিয়েছিল। তিনি স্কুলের গণিতশিক্ষক ছিলেন, কিন্তু কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে বি. এ. পরীক্ষায় বাংলা ভাষার অন্যতম পরীক্ষক নিযুক্ত করেছিলেন। তাঁর মৃত্যুর কিছুকাল পূর্বে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় বাংলা ভাষায় বৈজ্ঞানিক সাহিত্যের প্রকর্ষ ও প্রসার সাধনের অনুকূলে একটি কর্মপদ্ধতি প্রণয়নের উদ্দেশ্যে একটি কমিটি নিযুক্ত করেছিলেন। জগদানন্দ এই কমিটির সভ্য মনোনীত হন। তৎকালীন ব্রিটিশ সরকারও তাঁকে 'রায়সাহেব' খেতাবে ভূষিত করেন। ১৩৩০ সনে তিনি বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মিলনের নৈহাটি অধিবেশনে বিজ্ঞান শাখার সভাপতি নির্বাচিত হয়েছিলেন।

জীবনে নানা দুঃখশোক জগদানন্দকে পেতে হয়েছে। তবুও অস্খলিত নিষ্ঠায় আপন কর্মে তথা ব্রতে আপনাকে সব সময় তিনি নিযুক্ত রেখেছেন। যাদের মধ্যে বাস করেছেন, যাদের সংস্পর্শে এসেছেন সকলের সঙ্গে যথাযোগ্য স্নেহ ভালোবাসা শ্রদ্ধার সম্বন্ধ স্থাপন করেছেন; তাঁর সহকর্মী, তাঁর প্রতিবেশী, একই আশ্রমের অধিবাসী, সকলের শ্রদ্ধা প্রীতি আকর্ষণ করেছেন। শান্তিনিকেতনেই ১৩৪০ সনের ১১ই আষাঢ় চৌষট্টি বৎসর বয়সে তাঁর দেহাবসান হয়।

১৩৭৬

পাঠভবনে যখন ষষ্ঠ বর্গের ছাত্র হিসেবে পড়তে যাই, তার অনেকদিন আগেই তাঁর দেহাবসান ঘটেছিল। অথচ, স্পষ্ট মনে পড়ে, সেই মুহূর্তের আশ্রমিক আবহে জগদানন্দ রায়ের নাম একটি জীবন্ত পুরাণের সাম্প্রতিকতায় প্রতিষ্ঠিত ছিল। ঐ নাম সদ্যঃপাতী শিশিরের মতো স্বাভাবিক ছিল সেদিন। শান্তিনিকেতন বিদ্যালয়ের প্রথম সর্বাধ্যক্ষ জগদানন্দকে আশ্রম-পরিবেশের বাইরে সেদিনও যেমন, তেমনি আজকেও কল্পনা করা অসম্ভব।

নামকরণে ব্যক্তিপরিচয় নিরূপণ একটি গ্রামীণ কুসংস্কার, এ কথা জেনেও তাঁর অর্থবহ নামের তাৎপর্য অনেকবার ভেবেছি। তাঁর জীবনচর্যা ও গ্রন্থকৃতি এই কথাটাই আমাদের মনে করিয়ে দেয়, জগৎ জুড়ে তাঁর আনন্দ ছড়িয়ে ছিল। জগদ্ব্যাপারের রহস্য উদ্‌যাপন করবার জন্যেই তিনি বিজ্ঞান সাধনায় বৃত হয়েছিলেন এবং শিশুর বিস্ময়ে সেই উৎসবে অংশগ্রহণের উদ্দেশ্যেই নিরন্তর ছোটদের বিজ্ঞানবিদ্যার আস্বাদ জুগিয়ে গিয়েছিলেন। নামানুষঙ্গে জগদীশচন্দ্র বসু স্মর্তব্য। জগদানন্দ যে 'জগদীশচন্দ্রের আবিষ্কার' নামক উদ্দীপক বইখানি লিখেছিলেন, সেটিকে আকস্মিক, বিক্ষিপ্ত তথ্যমাত্র বলে মনে করার কারণ দেখি না।

জগদানন্দ ছোটদের জন্যে অন্তত পনেরোটি বই লিখেছিলেন। সবগুলিই বিজ্ঞানের। বইগুলির ভূমিকা বা উৎসর্গ-অংশ থেকে এই সব উৎকলন প্রসঙ্গত মনে আসে :

১. দীর্ঘকালব্যাপী পরিশ্রমের ফলে আলো প্রকাশিত হইল। ইহা সাধারণ পাঠক ও আমাদের বালকবালিকাদের চিত্তাকর্ষণ করিলে শ্রম সার্থক জ্ঞান করিব।

২. ছোটো ছেলেমেয়েদের পড়ার উপযোগী উদ্ভিদ্‌বিদ্যার কোনো বই

বাংলা ভাষায় নাই। তাই বাংলা দেশের সাধারণ গাছপালার পরিচয় দিয়া বইখানি রচনা করিয়াছি। ইহাতে গাছের শ্রেণী-বিভাগ এবং তাহাদের জীবনের খুঁটিনাটি ব্যাপারগুলি বুঝাইবার চেষ্টা করি নাই। বইখানি পড়িয়া যাহাতে ছেলেমেয়েদের অনুসন্ধিৎসা জাগিয়া উঠে, পুস্তকরচনার সময় সেই দিকেই বিশেষ দৃষ্টি রাখিয়াছিলাম।

৩. যখন বইখানি লেখা হইতেছিল, তখন কতক অংশ পড়িয়া আশ্রম-বালকদের শুনাইয়াছিলাম ; ইহাতে তুমিই বেশি আনন্দ পাইয়াছিলে। যখন তুমি রোগশয্যায় শয়ান, বই ছাপা হইল কিনা, তখনো সন্ধান লইয়াছিলে। এখন তুমি পরলোকে ; বড়ই আক্ষেপ হইতেছে, ছাপা বই তোমার হাতে দিতে পারিলাম না। তাই আজ এখানি তোমার নামে উৎসর্গ করিলাম।

এই সব উদধৃত বাক্যে যে আনন্দ বা ঔৎসুক্যের কথা বলা হয়েছে, তাই ছিল জগদানন্দের সাধনার প্রধান সূত্র। তিনি এই মর্মে সজাগ ছিলেন যে শাস্ত্রশিক্ষার ভরকেন্দ্র জীবন। এবং ব্যাবহারিক বিজ্ঞানচর্চার উপর জোর না দিয়েও তাই বিজ্ঞান অনুশীলনের জীবনমুখী ধারাটি সন্ধান করবার আগ্রহে তিনি একনিষ্ঠ থাকতে চেয়েছিলেন। আর সেই পথে কোনো-রকম অন্তরায় তিনি মানতে রাজি ছিলেন না। বাংলা ভাষায় বিজ্ঞান-চর্চার অন্যতম পুরোধা এই পুরুষের নিম্নোক্ত বক্তব্যই তার দৃপ্ত নিদর্শন :

বিদ্যুৎতত্ত্ব সম্বন্ধে যে-সকল বিদেশী বৈজ্ঞানিক শব্দ সাধারণের নিকট সুপরিচিত, সেগুলির কিম্ভূতকিমাকার বাংলা পরিভাষা গড়িয়া পুস্তকে ব্যবহার করি নাই। জর্মন পণ্ডিতেরা যে পরিভাষার গঠন করিয়াছেন, ইংরেজ বৈজ্ঞানিকেরা তাহা অসংকোচে ব্যবহার করেন, আবার ইংরেজেরা যে-সকল পরিভাষা রচনা করিয়াছেন, সেগুলিকে

> ফরাসি জাপানি বা রুশ বৈজ্ঞানিকেরা ব্যবহার করিতে দ্বিধাবোধ করেন না। পৃথিবীর সর্বত্রই ইহা দেখা যাইতেছে। সুতরাং বিশেষ বিশেষ বিদেশী বৈজ্ঞানিক পরিভাষা আমরা কেন আমাদের মাতৃভাষায় লিখিত পুস্তকে ব্যবহার করিব না, তাহার কোনো হেতু পাওয়া যায় না। সংস্কৃতভাষামূলক কটোমটো দেশী পরিভাষা বৈদেশিক পরিভাষার চেয়ে দুর্বোধ্য বলিয়া মনে করি।

এই আধুনিক বোধ অক্ষুণ্ণ ছিল বলে তাঁর ভাষায় টেলিফোন, টেলিগ্রাফ রবার, প্যারাফিন, অক্সিজেন, হাইড্রোজেন, ইউরেনিয়াম প্রভৃতি শব্দ ক্লিষ্ট তর্জমায় কণ্টকিত হয়নি। পক্ষান্তরে, আবেশবেষ্টনী (induction coil), আত্ম-আবেশ (self-induction), বৈদ্যুতিক আন্দোলন (electric oscillation) মাত্রা (unit) ন্যুব্জ (concave) প্রভৃতি শব্দ তাঁকে মেনে নিতে হয়েছিল শ্রুতিসৌকর্যের গরজে। শব্দ সম্পর্কে অনুসূক্ষ্ম ধারণা ছিল বলেই X-Rayকে বাংলায় তিনি এক্স-রে হিসেবেই অব্যাহত রেখেছেন, যদিও Cathode Ray হয়ে উঠেছে 'ঋণ-রশ্মি'। বৈজ্ঞানিক শব্দের ব্যবহার ঘটাতে গিয়ে তিনি আরেকটি স্বভাবের দ্বারা বিভাবিত ছিলেন, যার নাম দেওয়া যেতে পারে 'চিত্রৈষণা'। অনেক সময় তিনি ছবির সূত্র ধরে সুন্দর পারিভাষিক অনুবাদ করেছেন। এখানে একটি অব্যর্থ উদাহরণ :

> এক রকম সাপের ছবি দিলাম। ইহাদের ইংরেজি নাম র‍্যাটেল (Rattle) সাপ। বাংলায় ইহাদিগকে ঝুম্‌ঝুমি সাপ নাম দিলাম। ...কতকগুলি গোটা গোটা ঘণ্টাকে উপরে উপরে সাজাইয়া রাখিলে যে রকমটি হয়, ঝুম্‌ঝুমির আকৃতি দেখিতে সেই রকমের।

তিনি জানতেন বৈজ্ঞানিক বীক্ষা জাগ্রত হতে পারে ছবির ভাষায়। তাই তিনি তাঁর গ্রন্থরাজির প্রচ্ছদ ও ভিতরের ছবি আঁকিয়ে নিয়েছিলেন আমাদের অগ্রণী শিল্পীদের দিয়ে। তালিকা তৈরি করতে বসলে দেখা

যাবে, এঁদের মধ্যে আছেন নন্দলাল বসু, অসিতকুমার হালদার, বিনোদবিহারী মুখোপাধ্যায়, ধীরেন্দ্রকৃষ্ণ দেববর্মা, রামকিঙ্কর বেইজ, বিনায়ক মাসোজি, অর্ধেন্দুপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়। এঁদের আঁকা ছবিগুলি প্রায়শই নির্জীব ডায়গ্রামে পর্যবসিত হয় নি, কিশোরভঙ্গিতে স্পন্দমান হয়ে উঠেছে।

ধ্বনি ও চিত্রকে জগদানন্দ উপমাযুক্তির কাজে লাগিয়েছেন। এই উদ্দেশ্যে তিনি শুধু ল্যাবরেটরির মধ্যেই আবদ্ধ থাকতে রাজি ছিলেন না। প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় স্মৃতিচারণসূত্রে জানিয়েছেন, 'বিজ্ঞানাগারে রীতিমতো পরীক্ষা দেখাইয়া বিজ্ঞান পড়াইতেন জগদানন্দ রায়। সন্ধ্যার পর বিরাট এক টেলিস্কোপের সাহায্যে মাঝে মাঝে আকাশের গ্রহনক্ষত্র দেখানো হইত।' বস্তুত ক্লাসঘর থেকে ক্রমশ বৃহত্তর পরিসরে বেরিয়ে আসা ছিল তাঁর শিক্ষাপদ্ধতির অঙ্গ। তাই এইভাবেই শুরু হয়ে যায় তাঁর নির্ভার পর্যালোচনা :

> ছুটির ঘণ্টার মত মিষ্টি আওয়াজ আর কারো নাই। তার পরে যখন অন্য ছেলেদের সঙ্গে খেলা করা যায় সেও বেশ মিষ্টি লাগে। কিন্তু দারোয়ান স্কুলের গেটের কাছে যে ঘড়ি পিটাইল তাহাতে কি রকম শব্দ উৎপন্ন হইয়া তোমার কানে পৌঁছিল তাহা বলিতে পার কি ? তুমি গলার ভিতরকার বাতাসকে কি এক রকম করিয়া নাড়াচাড়া করিলে এবং তোমার গলা হইতে "মা" বলিয়া একটা শব্দ বাহির হইল,—মা তাহা ও-ঘর হইতে শুনিয়া এ-ঘরে তোমার কাছে আসিলেন। এ ব্যাপারটা কি রকমে ঘটিল, ইহাও আশ্চর্য নয় কি ?

প্রত্যক্ষের ভিতর নিহিত এই আশ্চর্যকে আবিষ্কার করবার গরজে তিনি বিজ্ঞানপ্রসঙ্গকে অনায়াসে প্রসারিত করেছেন সংগীতচিন্তায় :

তোমরা বোধহয় মনে কর, সেতার ও তানপুরার পিছনে যে

লাউয়ের প্রকাণ্ড খোল থাকে তাহা যন্ত্রের শোভা বৃদ্ধির জন্য। কিন্তু তাহা নয়। তারে ঘা দিলে যে দুর্বল শব্দের ঢেউ হয়, লাউয়ের তুম্বি ও তাহার ভিতরকার বাতাস জোরে কাঁপিয়া সেই রকমের মিষ্ট অথচ জোরালো সুর উৎপন্ন করে। ঢাক-ঢোল, বেহালা-সারিঙ্গা, ডাইনে-বাঁওয়া প্রভৃতি সকল বাদ্যযন্ত্রের খোলও ঠিক ঐ কাজ করে। ঢাকে কাঠি দিলে যে-শব্দটা এক ক্রোশ তফাৎ হইতে শুনা যায়, তাহার ঢেউ কেবল চামড়া কাঁপিয়া উৎপন্ন করে না। ঢাকের খোলের কাঠ ও তাহার ভিতরকার বাতাস চামড়ার কাঁপুনিতে যখন জোরে কাঁপিয়া উঠে, তখনই শব্দ প্রবল হয়।

যে-কোনো ছবি তাঁকে পৌঁছে দিত মৌল সংগীতে আর জগদানন্দ তখন তাঁর বক্তব্যে স্বর্গীয় আবেগ ধরিয়ে দিতে পারতেন :

অন্ধকার মৃত্যু, আলো প্রাণ। অন্ধকার দুঃখ, আলোই আনন্দ। মেঘে-মেঘে, লতায়-পাতায়, ফুলে-ফলে, পাখির পালকে প্রজাপতির ডানায় তোমরা যে সব রং দেখিতে পাও, আলোই তাহা উৎপন্ন করে। কোটি কোটি ক্রোশ দূরের নক্ষত্রলোকে যে অগ্নিকাণ্ড চলিতেছে, তাহার খবর নক্ষত্রদের ক্ষীণ আলোর রেখাই আমাদের কাছে পৌঁছাইয়া দেয়। ব্রহ্মাণ্ডে যদি আলো না থাকিত, তাহা হইলে এই সৃষ্টির মূর্তি যে কি হইত, তাহা ভাবিলেও হৃদ্‌কম্প হয়। যে জন্মান্ধ তাহার কাছে এই পৃথিবী যেমন নিরানন্দ ও আলোকহীন, ব্রহ্মাণ্ড বোধ করি তাহা অপেক্ষাও নিরানন্দ হইত। তাই আলোই সকল আনন্দের মূল। আলোর কাজগুলি দেখিলে কবির সেই গানটা মনে পড়িয়া যায়, 'আলো, আমার আলো, ওগো, আলো ভুবনভরা।'

জগদানন্দ বিজ্ঞান এবং সাহিত্যের মধ্যে কোনো কৃত্রিম শিবিরবিভেদ স্বীকার করেননি। ছোটোদের বিজ্ঞানের বই তিনি সযত্নে তুলে দিয়েছেন

'পরম সাহিত্যানুরাগী' যোগীন্দ্রনারায়ণ রায়কে। 'অগভীর' সাহিত্য-বোদ্ধা হিসেবে তাঁর আত্মকৌতুকের পরিচয় মিলবে এক বিজ্ঞানী বন্ধুর আকস্মিক সাহিত্যানুশীলন বর্ণনায় :

> সেদিন রবিবার, বন্ধুর আফিস বন্ধ—তাঁহার সেই ক্ষুদ্র সজ্জিত ঘরে, মেজের এক প্রান্ত অধিকার করিয়া কি লিখিতেছিলেন। আমাকে আসিতে দেখিয়াই তিনি স্মিতমুখে চেয়ার টানিয়া বসিতে বলিলেন। তাঁহার লিখিত বিষয়ের কথা জিজ্ঞাসা করিবার পূর্বেই তিনি বলিলেন, 'আজকাল মাসিক পত্রাদিতে, বেশ ছোট ছোট গল্প দেখে, একটা গল্প লিখতে চেষ্টা করছিলুম, গল্পটা প্রায় লেখা শেষ হয়েছে, এখন শেষ মিলাতে গিয়ে বড় গোলযোগ হয়েছে।' বন্ধুর এই অস্বাভাবিক পরিবর্তন ও অবৈজ্ঞানিক ব্যবহার দেখিয়া বড় বিস্মিত হইলাম; আমার জানা ছিল বৈজ্ঞানিকদের কাব্যপ্রিয় হওয়া একটি ভয়ানক ফ্যাসানবিরুদ্ধ কার্য, ঘোর ফ্যাসানানুরাগী বন্ধুর পূর্ব ব্যবহার দ্বারা এ বিশ্বাস দৃঢ়ীভূত ছিল, কিন্তু তাঁহাকেই কাব্যসেবী দেখিয়া বিস্ময়ের সীমা রহিল না। তাঁহার পাঠগৃহের মেঝের উপর বড়ো বড়ো বৈজ্ঞানিক পুস্তকরাশি সজ্জিত ছিল, এখন দেখিলাম তাহার সকলগুলিই আলমারিবদ্ধ হইয়াছে; শেক্সপীয়র, শেলি, টেনিসন, মাইকেল, রবীন্দ্রনাথ ও বঙ্কিমের চকচকে বাঁধানো পুস্তক টেবিল অধিকার করিয়াছে। বন্ধুবর সাগ্রহে তাঁহার লিখিত গল্পটি পড়িয়া শুনাইলেন।...তাঁহার সরস গল্পটির উপর মনঃসংযোগের অবসর পাই নাই; তবে গল্প পাঠান্তে শেষ মিলানো সম্বন্ধে অবসর পরামর্শ চাহিলে এটাকে ট্রাজিক করা ভাল বলিয়া যে একটা "বেখাপ" উত্তর দিয়াছিলাম, তাহা বেশ মনে আছে, এবং বন্ধুবর এই উত্তর শুনিয়া তাঁহার পরামর্শদাতাকে নিতান্ত কাব্যরসবর্জিত ঠাহরাইয়া, যে দুয়েকটি সরস বাক্য প্রয়োগ করিয়াছিলেন তাহাও ভুলি নাই।

বিস্তারিত এই উপভোগ্য বিবরণী পড়ে এটা বুঝে নেওয়া আদৌ শক্ত নয় উল্লিখিত সেই সাহিত্যোৎসাহী এবং জগদানন্দের মধ্যে কে প্রকৃত সাহিত্যবেত্তা ছিলেন। এখানে আরেকটি তথ্যও পাঠকের চোখ এড়িয়ে যাবে না: নিজের সাহিত্যিকসত্তাকে জগদানন্দ প্রাণপণে লোকচক্ষুর আড়ালে অগোচর রাখতে চেয়েছেন। কিন্তু তাঁর স্বাভাবিক অথচ আশ্চর্য হিউমার তাঁর যথার্থ পরিচিতিকে সূর্যের আলোর মতো স্ফুটতর করে পাঠকের কাছে তুলে ধরেছে। জগদানন্দের গদ্যের সবচেয়ে বড়ো গুণ এই হিউমার যা তাঁকে, তাঁর তপস্যার বিশেষত্ব অক্ষুণ্ণ রেখেও, কাণ্ডজ্ঞানসম্পন্ন সামাজিক ভাবুক হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেছে।

এ সমস্ত সাফল্য সত্ত্বেও তাঁকে সাহিত্যিক বললে ভুল হবে। সাহিত্য-রচনার জন্যে যে কেন্দ্রিত প্রযত্নের প্রয়োজন তার অবকাশ তিনি পান নি। তাঁর প্রধান ভূমিকা ছিল শিক্ষকের। শিলাইদহের গৃহবিদ্যায়তনে এই শিক্ষকের শুভব্রত সূচিত হয়েছিল। জীবনব্যাপী আনন্দযজ্ঞের নিরন্তর অনুষ্ঠানে কোথাও কোনো ফাঁক পড়ে নি তাঁর। এরই অনুষঙ্গে তিনি কয়েকটি গ্রন্থ রচনা করেছেন এবং সে-সব গ্রন্থের জোরে বাংলা ভাষায়, প্রাত্যহ বিজ্ঞানের আলোচনায় পথিকৃৎরূপে তিনি স্মরণীয়তা অর্জন করতে পেরেছেন। যত প্রতিভাবান বিজ্ঞানী ছিলেন তার চেয়েও বহুগুণে মেধাবীতর বিজ্ঞানরসজ্ঞের আসনে তিনি আমাদের মানসে অধিষ্ঠিত রয়ে যাবেন। জ্ঞানবিজ্ঞানের অধুনাতন বহুধাবিভাজন এবং ঊষর হৃদয়হীন চর্চার যুগে সর্বাঙ্গীণ ব্যক্তিত্বের সহজসুন্দর আদর্শপুরুষ হিসেবে তাঁর স্থান থাকবে রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীর পাশেই।

১৩৭৬

স্মৃতি

জগদানন্দ রায়

১৯০১ সালের শ্রাবণ মাসে যখন শান্তিনিকেতনে প্রথম আসি, সেদিনকার কথা বেশ মনে পড়ে। গুরুদেব শিলাইদহের জমিদারির কর্তৃত্ব ছাড়িয়া আগেই সপরিবারে শান্তিনিকেতনে আসিয়াছিলেন। আমি বাড়ি ঘুরিয়া কয়েকদিন পরে আসিলাম। তখন বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয় নাই। আমি যখন শিলাইদহে জমিদারি সংক্রান্ত কাজে নিযুক্ত ছিলাম, সেই সময়ে শ্রীমান রথীন্দ্রনাথকে একটু একটু গণিত শিক্ষা দিতাম। জমিদারির জটিল কাজ আমার ভালো লাগিত না। কেবল ভালো না-লাগা নয়, জমিদারি সংক্রান্ত কাজে একটা হাঙ্গামাও বাধাইয়াছিলাম। ইহাতে আমাকে কয়েকদিন অজ্ঞাতবাসে থাকিতে হইয়াছিল। জেলখানায় নয়। তাই যখন শুনিলাম গুরুদেব শান্তিনিকেতনে থাকিবেন এবং সেখানে বিদ্যালয় হইবে, তখন তাঁহার সঙ্গ লইয়া আনন্দ বোধ করিয়াছিলাম। যদি জমিদারির কাজেই থাকিয়া যাইতাম, তাহা হইলে আজ আমার কী দশা হইত তাহা অনুমানই করিতে পারি না। আশ্রমে আসিবার পূর্বে যেদিন গুরুদেব আমাকে জোড়াসাঁকোর বাড়িতে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি জমিদারির কাজে থাকিতে চাও, না আমার সঙ্গে শান্তিনিকেতনে যাইতে চাও" সেই দিনটা আমার জীবনের একটা স্মরণীয় দিন। আমি সানন্দে বলিয়া ফেলিলাম, "আমি নায়েব হইতে চাহি না। আপনার সঙ্গে শান্তিনিকেতনেই যাইব।" গুরুদেব বলিলেন, "তথাস্তু"। হাতে স্বর্গ পাইলাম।

যাহা হউক শান্তিনিকেতনে আসিয়া দেখিলাম রথীন্দ্রনাথের সংস্কৃত-শিক্ষক শ্রীযুক্ত শিবধন বিদ্যার্ণব মহাশয় আগেই আসিয়াছেন। খুব আনন্দ হইল। তিনি খুব রসিক লোক ছিলেন। ভোরে উঠিয়াই

বিদ্যার্ণব ও রথীন্দ্রনাথের সঙ্গে খোয়াই দেখিতে বাহির হইলাম। উত্তরায়ণের পশ্চিমে যে খোয়াইটি আছে, সেখানে খুব দৌড়াদৌড়ি করা গেল। এ পর্যন্ত নদীয়া জেলার সমতল ভূমির সীমানা ত্যাগ করি নাই। বীরভূমের রাঙামাটি ও অসমভূমি এবং দিগন্তবিস্তৃত প্রান্তর খুব ভালো লাগিল। আর ভালো লাগিল শান্তিনিকেতন আশ্রমটি। মনে হইতে লাগিল যেন উদ্ভিদ্‌বিরল মহাপ্রান্তর তাহার সমস্ত রসধারা নিঃশেষ করিয়া কোলের ছেলের মতো এই আশ্রমটিকে শ্যামলশ্রীতে মণ্ডিত রাখিয়াছে।

আশ্রমে আসিলাম বটে, কিন্তু আমার আগমনে একটি অতিথি আশ্রম ত্যাগ করিলেন। কলিকাতার স্বর্গীয় হে-বাবু কয়েকদিন গুরুদেবের সহিত অবস্থান করিবেন বলিয়া বেশ গুছাইয়া বসিয়াছিলেন। তখন আমি ম্যালেরিয়া রোগী। স্বাস্থ্য কাহাকে বলে জানিতাম না। বৎসরের মধ্যে দশ মাস শয্যাগতই থাকিতাম। বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠে আম-কাঁঠাল খাইয়া একটু সুস্থ বোধ করিলে আষাঢ়ে ম্যালেরিয়ায় ধরিত, এবং তাহার জের ফাল্গুন-চৈত্রের পূর্বে শেষ হইত না। সুতরাং প্রথম দর্শনেই হে-বাবু বুঝিয়া লইলেন ম্যালেরিয়া রোগী। মশকই যে ম্যালেরিয়া-বীজের বাহন বোধ করি তখন সদ্য আবিষ্কৃত হইয়াছে। হে-বাবুর ভয় হইল পাছে আমাকে কামড় দিয়া মশারা তাঁহাকে কামড়ায়। প্রথমে একটা মশারির মধ্যে আমার শয়নের ব্যবস্থা হইল; তার পরে ডবল মশারির ভিতরে। কিন্তু ইহাতেও হে-বাবুর আশঙ্কা গেল না। মশারা দুই শত গজ রাস্তা উড়িলে হাঁফাইয়া পড়ে, এই তত্ত্বটিও সেই সময়ে আবিষ্কৃত হইয়াছিল। হে-বাবুর শয়নকক্ষ হইতে দুইশত গজ দূরে আমাকে নির্বাসিত করা হইল। তবুও মশার পাল তাঁহার মশারির চারিদিকে ঘুরিতে লাগিল। অগত্যা হে-বাবু আশ্রম ত্যাগ করিতে বাধ্য হইলেন।

আমরা যখন শান্তিনিকেতনে আসিলাম, তখন বাড়িঘরের মধ্যে অতিথিশালার দোতলা বাড়ি এবং এখন যে-বাড়িতে ডাকঘর আছে, তাহাই ছিল। দক্ষিণ দিকে ছিল, এখন যেখানে লাইব্রেরি আছে তাহারই মাঝের হল্‌ঘরটা এবং পাশের দুটি ছোট কুঠরি। আর অতি দূরে বাঁধের ধারে নীচুবাংলা দেখা যাইত। তখন নীচুবাংলা খড়ে-ছাওয়া একখানা বড় আটচালা ঘরের আকারে ছিল। সেখানে কাহাকেও তখন বাস করিতে দেখি নাই। ভৃত্যেরা ডাকঘরের বাড়িতে থাকিত। সেখানেই অতিথিদের জন্য রন্ধনাদি হইত। জয়পুরী সাদা পাথরের থালা-বাটি বোধকরি দশ-বারো সেট ছিল। অতিথি আসিলে সেইসকল ভোজনপাত্রে আহার করিতেন। প্রত্যেক বেলায় পাঁচ-সাত রকম নিরামিষ তরকারি থালায় সাজাইয়া দেওয়া হইত।

শান্তিনিকেতনে আসিয়া আমি এবং বিদ্যার্ণব মহাশয় আশ্রয় পাইলাম আজকালকার লাইব্রেরি-বাড়ির পশ্চিম কুঠরিতে। তখনও বাড়ির কাজ সম্পূর্ণ শেষ হয় নাই। শীঘ্রই ব্রহ্মবিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইবে বলিয়া তাড়াতাড়ি কাজ চলিতেছিল। কিন্তু আশ্রমের এ দিকটা ছিল ভয়ানক জঙ্গলাকীর্ণ। এখন যেখানে শিশুবিভাগ, নারীবিভাগ ও হাসপাতাল আছে সেদিকে ভুলিয়াও কেহ পা দিত না। এই জায়গাগুলি ছোট-বড় শাল ও কাঁটাগাছে আচ্ছন্ন ছিল। শুনিতাম শিয়াল ও হেঁড়েলের দল নাকি এইসব জঙ্গলে আশ্রয় লইত। শিশুবিভাগ, বীথিকাগৃহ ও কালাচাঁদবাবুর বাসার কাছের শালগাছগুলি এখনো সেই শালবনের সাক্ষ্য দিতেছে। এই জঙ্গলের তলা কিন্তু বেশ পরিচ্ছন্ন ছিল। পরে আমরা এই জঙ্গলের নীচে লুকোচুরি খেলা করিয়াছি মনে পড়ে। তখন দিন-দুপুরে ও সন্ধ্যার পরে সরকারি সদর রাস্তা দিয়া লোকজন চলিতে ভয় পাইত। শুনিয়াছিলাম, আমাদের শান্তিনিকেতনে আসিবার

কিছুদিন আগেও গোয়ালপাড়ার রাস্তায় দুষ্ট লোকদের হাতে পথিকেরা লাঞ্ছিত হইত।

এই সময়ে আমাদের অধ্যাপনার কাজ বেশি ছিল না। আমি রথীন্দ্রনাথকে দিনে অল্পক্ষণের জন্য গণিত শিক্ষা দিতাম এবং হক্সলির যে ছোট বিজ্ঞানের বইখানা এন্‌ট্রেন্সের পাঠ্য ছিল, তাহাই সন্ধ্যার পরে পড়াইতাম। আর সংস্কৃত পড়াইতেন শিবধন বিদ্যার্ণব মহাশয়। বাকি বিষয়ের অধ্যাপনার ভার আমাদের উপরে ছিল না। গুরুদেব নিজেই সে বিষয়গুলি পড়াইতেন। শিলাইদহেও তাঁহাকে ছেলেমেয়েদের নিজে পড়াইতে দেখিয়াছি। সেখানে লরেন্স নামে এক সাহেব মাস্টার ও একজন পণ্ডিত ছেলেমেয়েদের পড়াইতেন। কিন্তু মাস্টার ও পণ্ডিতের হাতে পুত্রকন্যাদিগকে সমর্পণ করিয়া গুরুদেব কখনই নিশ্চিন্ত থাকিতে পারিতেন না। এমনকি আমরা যখন পড়াইতাম, তখন কাছে বসিয়া তাহা শুনিতেন।

এই সময়ের একটা সামান্য ঘটনার কথা মনে পড়িয়া গেল। একদিন সন্ধ্যার পরে আমি রথীন্দ্রনাথকে বিজ্ঞান পড়াইতেছিলাম। তখন সদ্য কলেজ ছাড়িয়া শিক্ষকতায় লাগিয়াছি। স্কুল-কলেজে তৃতীয় শ্রেণী হইতে আরম্ভ করিয়া বি. এ., এম. এ., ক্লাস পর্যন্ত শিক্ষক ও অধ্যাপকেরা ইংরাজিতে অধ্যাপনা করেন। আমার ছাত্রটি এন্‌ট্রেন্সের পরীক্ষার্থী সুতরাং ছাড়িব কেন? অনর্গল ইংরেজি ভাষায় রথীন্দ্রনাথকে পড়া বুঝাইতেছিলাম। ইংরেজিতে কত ভুল হইতেছে, সেদিকে লক্ষ্যই নাই, অবিরাম ইংরেজি বলিয়াই চলিয়াছি। গুরুদেব কাছে বসিয়া পড়ানো শুনিতেছিলেন এবং বোধ করি মনে মনে হাসিতেছিলেন। শেষে তিনি আমাকে থামাইয়া বলিলেন—"দেখ, তুমি আর ইংরেজিতে পড়াইয়ো না।" তাঁহার কথায় চৈতন্য হইল। সেইদিন হইতে এ পর্যন্ত কোনো ছাত্রকে ইংরেজিতে কিছু শিখাইবার চেষ্টা করি নাই। জাতীয় ভাষাকে

শিক্ষার বাহন করিলে যে, অল্পায়াসে সুশিক্ষাদান সম্ভব, আজ আমাদের দেশের লোকেরা বুঝিয়াছেন এবং বিশ্ববিদ্যালয়ে জাতীয় ভাষায় শিক্ষা দিবার আয়োজন হইতেছে। কিন্তু গুরুদেব পঁচিশ বৎসর পূর্বে আমাদের বিদ্যালয়ে বাংলায় শিক্ষাদান-পদ্ধতি প্রচলন করিয়াছিলেন।

ক্রমে পূজার ছুটি কাছে আসিল। আমরা বাড়ি ফিরিবার জন্য চঞ্চল হইয়া পড়িলাম। এই সময়ের একটা ঘটনার কথা মনে পড়িতেছে। দুই মাস শান্তিনিকেতনে আছি, অথচ আমরা পারুলবন ও আমানি ডোবা ছাড়া আর বাহিরের কোনো জায়গা দেখিলাম না, ইহা মনে করিয়া হঠাৎ বিদ্যার্ণব মহাশয় ক্ষুব্ধ হইয়া পড়িলেন। একদিন দ্বিপ্রহরে আহারের পরে আমরা দু'জনে ভ্রমণে বাহির হইয়া পড়িলাম। বোলপুর শহর ছাড়িয়া সোজা একটা রাস্তা ধরিয়া চলিতে আরম্ভ করা গেল। রাস্তা শেষ হইয়া ধানের ক্ষেতে পড়িল; সেদিকে দৃক্‌পাত নাই, ক্রমাগত অগ্রসর হওয়াই গেল। শেষে যখন সন্ধ্যা ঘনাইয়া আসিল এবং ক্ষুৎপিপাসায় কাতর হইয়া পড়িলাম তখন আমাদের চৈতন্য হইল। কাছে একটা সাঁওতালপল্লী ছিল; অনুসন্ধানে জানিলাম বোলপুর শহর সেখান হইতে তিন ক্রোশ; শান্তিনিকেতন আরো দূরে। সাঁওতালরা ফিরিবার পথ দেখাইয়া দিল। অন্ধকার রাত্রি, তার উপরে একগলা ধানের ভিতর দিয়া সরু রাস্তা, পথে জনপ্রাণী নাই। মহা বিপদে পড়া গেল। তখন দিক্‌ভ্রম হইয়া গেছে; দূরে দিগন্তে কোনো গাছপালার চিহ্ন দেখিলেই মনে হইতে লাগিল এই বুঝি শান্তিনিকেতন। রাত্রি যখন নয়টা তখন অতি দূরে আলোর ক্ষীণ রেখা দেখা গেল। বাঁচা গেল—সেই আলো লক্ষ্য করিয়া চলিতে লাগিলাম, এবং শেষে উপস্থিত হওয়া গেল একটি কুটিরে। এখানে গ্রাম নেই, শ্মশানের উপরে এই কুটির, দুইজন ভৈরব তাহার অধিবাসী। যাহা হউক, আমাদের অবস্থা দেখিয়া ভৈরবদের হৃদয়েও দয়ার উদয় হইল। তাঁহারা বলিলেন,

ইহা কঙ্কালী দেবীর স্থান। সন্ধ্যার পরে কোনো গৃহস্থই এখানে আসিতে সাহস করে না। যাহা হউক, ভৈরবেরা আমাদের সাহসের প্রশংসা করিয়া আদরে আহারাদির ব্যবস্থা করিয়া দিলেন এবং শেষে আলো লইয়া রেলের সাঁকো অবধি সঙ্গে আসিলেন। যখন শান্তিনিকেতনে পৌছিলাম, তখন রাত্রি প্রায় দুটা। এইরকমে আমাদের নিশীথ-অভিযান শেষ হইল বটে, কিন্তু পরদিন আমার খুব কম্প দিয়া জ্বর আসিল।

পূজার ছুটির পরে আশ্রমে ফিরিয়া শুনিলাম ব্রহ্মবিদ্যালয় ৭ই পৌষ প্রতিষ্ঠিত হইবে। কিভাবে তাহার কাজ চলিবে সে-সম্বন্ধে অনেক কথা শুনিতে লাগিলাম। শিলাইদহের হোমিয়োপ্যাথ ডাক্তার কালীপ্রসন্ন লাহিড়ী মহাশয় এই সময়ে শান্তিনিকেতনে আসিলেন। বোধ করি ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায় মহাশয় এই সময়ে দুই-একবার আশ্রমে আসিয়া বিদ্যালয় সম্বন্ধে পরামর্শ করিতে লাগিলেন।

১৯০১ সালের ২২শে ডিসেম্বর অর্থাৎ ৭ই পৌষ ব্রহ্মবিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইল। কলিকাতা হইতে আগত অনেকেই সেই অনুষ্ঠানে যোগ দিয়াছিলেন। পূজনীয় সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়, ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায় প্রভৃতি অনেকে এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। এখনকার লাইব্রেরির মাঝের ঘরে সভা হইয়াছিল। যতদূর মনে পড়ে শ্রীমান রথীন্দ্রনাথ, সুধীরকুমার নাগ, গিরীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য, গৌরগোবিন্দ গুপ্ত এবং প্রেমকুমার গুপ্ত এই পাঁচটি বালক ব্রহ্মবিদ্যালয়ের ছাত্ররূপে দীক্ষা গ্রহণ করিয়াছিলেন। রক্তক্ষৌম বস্ত্র ও উত্তরীয় পরিধান করিয়া ইঁহারা যেরূপে দীক্ষা গ্রহণ করিলেন, তাহা আজ সুস্পষ্ট মনে পড়িতেছে। আমি এবং বিদ্যার্ণব মহাশয় তসরের ধুতি-চাদর পরিয়া নিকটে ছিলাম। এই অনুষ্ঠানের বিশেষ বিবরণ এবং পূজনীয় গুরুদেবের উপদেশের মর্ম ১৯০১ সালের মাঘের তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছিল।

বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার পরে অনেকদিন ধরিয়া উপাধ্যায় মহাশয় গুরুদেবের সহিত পরামর্শ করিয়া সকল বিষয়ের সুব্যবস্থা করিতেন। তাঁহারই উদ্যোগে ছাত্র-কয়েকটিকে পাওয়া গিয়াছিল। প্রতিষ্ঠার কিছুদিন পরে চুঁচুড়া-নিবাসী শ্রীযুক্ত মনোরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় এবং শ্রীযুক্ত রেবাচাঁদ বিদ্যালয়ের শিক্ষক হইয়া আসিলেন। রেবাচাঁদের উপরে ছাত্র-পরিচালনার ভার ছিল। তিনি বড় কড়া লোক ছিলেন। ছেলেরা যেমন তাঁহাকে ভালোবাসিত তেমনি তাঁহার ভয়ে কাঁপিত। আমরা পড়াইয়াই খালাস পাইতাম। রেবাচাঁদের কঠোর শাসননীতি আমাদের কিন্তু ভালো লাগিত না। এখন যেমন সকাল-সন্ধ্যায় ছেলেরা উপাসনা করে, এবং খালি-পায়ে থাকে, বিদ্যালয় আরম্ভের দিন হইতেই তাহার সূত্রপাত হইয়াছিল। প্রত্যেকের এক-একখানি চেলির কাপড় ও চাদর থাকিত। তাহা পরিয়া ছেলেরা উপাসনায় বসিত। আহারের সময়ে প্রত্যেকে গাড়ুভরা জল লইয়া আহারস্থানে যাইত। বলা বাহুল্য, পট্টবস্ত্র, গাড়ু, থালা, বাটি ইত্যাদি সকলই বিদ্যালয়ের খরচ হইতে দেওয়া হইত। অনেক ছাত্রের বিছানাও বিদ্যালয় হইতে দিতে দেখিয়াছি। তখন কোনো ছাত্রের নিকট হইতে নিয়মিত বেতন লওয়া হইত না। পাকশালা ছিল না; এখানকার লাইব্রেরির মাঝের ঘর এবং তাহারই পাশের দুইটি ছোট ঘর ছাড়া আর ঘরও ছিল না। রথীন্দ্রনাথের মাতৃদেবী তখন জীবিতা। তিনি তরকারি কুটিয়া এবং আহার্যসামগ্রী সাজাইয়া পাঠাইয়া দিতেন। রান্না হইত পোস্টআপিস-সংলগ্ন যে-ঘরে মোটর থাকিত, সেই ঘরে। ছাত্র ও অধ্যাপকের সংখ্যা বেশি ছিল না, আহারও সেখানে বসিয়া হইয়া যাইত। মাতাঠাকুরানীর সুব্যবস্থায় ছাত্র ও অধ্যাপকেরা কিছুদিন যে আনন্দ পাইয়াছিলেন তাহা ভুলিবার নয়। আমাদের সকাল-বিকালের জলখাবার তাঁহার নিজের তত্ত্বাবধানে প্রস্তুত হইয়া আমাদের কাছে আসিত।

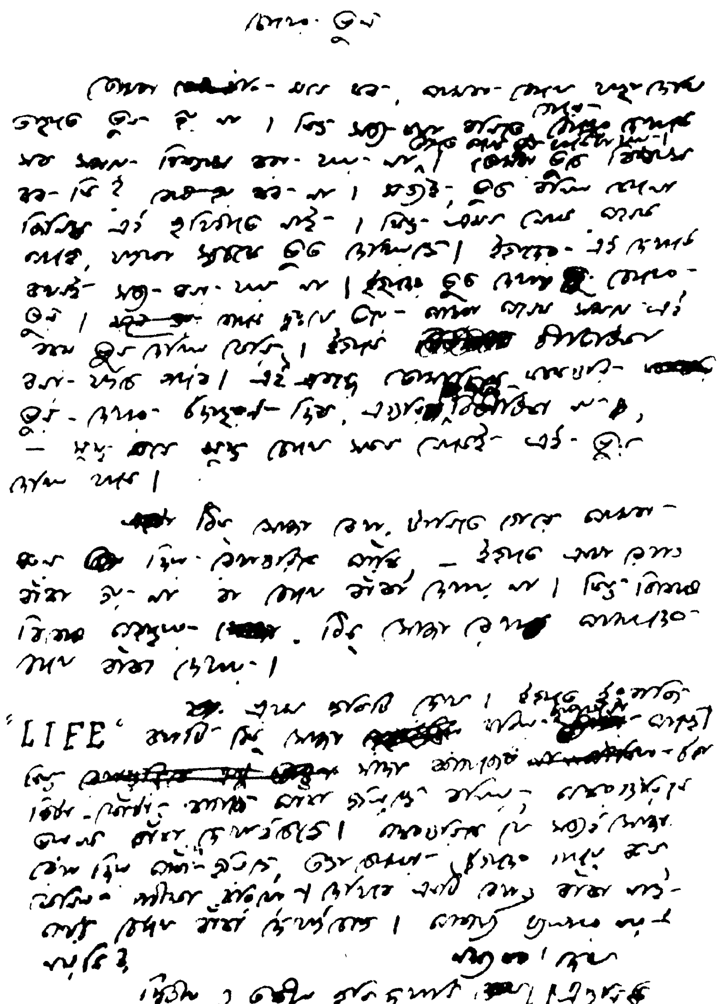

জগদানন্দ রায়ের পাণ্ডুলিপি

এই সময় হইতে আরম্ভ করিয়া বৎসরের পর বৎসর গুরুদেব প্রায় সর্বদাই ছেলেদের সঙ্গে থাকিতেন। রাত্রিতে ছেলেদের পড়াশুনার পাট ছিল না। ছেলে অল্প ছিল, ক্লাসেই আমরা তাহাদের পড়াশুনা শেষ করাইয়া দিতাম। সন্ধ্যায় গুরুদেব ছেলে ও অধ্যাপকদের লইয়া পুস্তকপাঠ গল্প ও নানা রকম খেলা করিতেন। সে এক আশ্চর্য সান্ধ্যসম্মিলন ছিল। আমরা ছাত্র ও অধ্যাপক সকলেই সন্ধ্যার জন্য প্রতীক্ষা করিয়া থাকিতাম। বলা বাহুল্য, গুরুদেবই এই সম্মিলনের নেতা ছিলেন। প্রত্যেকদিনই তিনি কি প্রকারে নূতন নূতন বিষয় লইয়া সকলের মনোরঞ্জন করিতেন, আমরা ভাবিয়া অবাক হইয়া যাইতাম। বৎসরের পর বৎসর এই সান্ধ্যসভায় উপস্থিত থাকিয়াছি কোনোদিনই তাঁহাকে ক্লান্ত দেখি নাই। আজকাল যাহাকে sense training বলা হয়, গুরুদেব আমাদের বিদ্যালয়ের বালকগণের মধ্যে প্রথমে তাহার সূত্রপাত করেন। একটা জায়গায় কতকগুলি কড়ির স্তূপ রাখা হইত। বালকগণ আন্দাজে তাহার সংখ্যা বলিয়া দিত। একটা পাত্রে আট-দশ রকম জিনিস রাখা হইত। ছাত্রেরা এক নজরে দেখিয়াই সেগুলির বিবরণ লিখিয়া দিত। তা ছাড়া আন্দাজে জিনিসের ওজন ও দৈর্ঘ্য নিরূপণ প্রভৃতির অনেক খেলা ছিল। বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার পরে আট-দশ বৎসর গুরুদেব এইসকল চালাইয়াছিলেন। ইহার উপরে তিনি দুই-তিনটি ইংরেজি বাংলা ও সংস্কৃত ক্লাসে শিক্ষা দিতেন এবং ছেলেদের কবিতা আবৃত্তি করাও শিখাইতেন। এই সময়ে অভিনয় যে ছিল না তাহা বলা যায় না। এখনকার লাইব্রেরি-ঘরে ছেলেরা হেঁয়ালি নাট্যের অভিনয় করিত। তাহার ব্যবস্থাও গুরুদেবকে করিতে হইত। এখন যেমন নূতন গান হইলে সংগীতজ্ঞরাই তাহা প্রথমে উপভোগ করেন, তখন তাহা ছিল না, নূতন গান হইলেই ছাত্র ও অধ্যাপকদের সান্ধ্যসভায় তাহা গীত হইত। কেহই বঞ্চিত হইত না।

"মোরা সত্যের পরে মন" এই গানটি বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার কয়েকমাস পরেই রচিত হইয়াছিল। আমি ও বিদ্যার্ণব মহাশয় বিকালে পারুলডাঙায় বেড়াইবার সময়ে এই গানটি জোর গলায় গাহিতাম মনে পড়ে। তা ছাড়া আমাদেরও মাঝে মাঝে বৈঠক বসিত। সেখানে রসসাগরের পাদপূরণের মতো খেলা চলিত। ইহাতে কেহ হয়তো একটা শব্দ বা বাক্য বলিতেন, তাহারই সঙ্গে মিল রাখিয়া মুখে মুখে তাড়াতাড়ি দুই ছত্রের কবিতা রচনা করিতে হইত। মনে পড়ে একবার শিবধন বিদ্যার্ণব মহাশয় বলিলেন "কীর্তির্যস্য স জীবতি" ইহার সহিত মিল রাখিয়া একটি কবিতা রচনা করিতে হইবে। তাড়াতাড়ি পাদপূরণ করা গেল—

হনুমতা হতা লঙ্কা
কীর্তির্যস্য স জীবতি।

খুব হাসির রোল উঠিয়াছিল। একবার আমাদের মধ্যে স্থির হইল, সাধারণ বাক্যালাপে ইংরেজি শব্দ একেবারে ব্যবহার করা হইবে না; ব্যবহার করিলে প্রত্যেক শব্দের জন্য এক পয়সা করিয়া জরিমানা দিতে হইবে। গুরুদেবও এই খেলায় যোগ দিয়াছিলেন। তাঁহাকে কিন্তু জরিমানা দিতে হয় নাই। বেশি জরিমানা দিয়াছিলেন শিবধন বিদ্যার্ণব মহাশয়। কারণ তিনি ইংরাজি লিখিতে পড়িতে জানিতেন না, কিন্তু কথাবার্তায় অনেক ইংরেজি শব্দ ব্যবহার করিতেন। শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয় একবার এই সময়ে আশ্রমে আসিয়াছিলেন। মনে আছে, ইংরেজি শব্দ ব্যবহার করার জন্য তাঁহাকে অনেক দণ্ড দিতে হইয়াছিল। এমন কি যখন কলিকাতায় ফিরিবার জন্য গাড়িতে উঠিতেছেন সে সময়েও চারি পয়সা জরিমানা দিয়াছিলেন।

উপাধ্যায় মহাশয়ের গায়ে খুব জোর ছিল। তিনি ক্রিকেট ইত্যাদি নানারকম খেলা জানিতেন। তাঁহার উদ্যম ও উৎসাহ ঠিক যুবকের মতোই দেখিতাম। প্রতিদিন উপাধ্যায় মহাশয় বিকালে ছেলেদের

লইয়া খেলা করিতেন। তিনি গৈরিক উত্তরীয়খানিকে সুকৌশলে জামার মতো গায়ে জড়াইয়া দৌড়াদৌড়ি করিতেন। উত্তরীয়কে গুটাইয়া জামার মতো গায়ে দেওয়ার কৌশল তখনকার অধ্যাপক ও ছেলেরা শিখিয়াছিলেন। এখন আমরা ভুলিয়া গিয়াছি। কিছুদিন একজন পালোয়ান ছেলেদের কুস্তি শিখাইত দেখিয়াছি। তার পরে একজন জাপানি কুস্তিগির ছেলেদের 'যুযুৎসু' শিখাইতে আরম্ভ করিয়াছিল।

যাহা হউক, ক্রমে ছাত্রের সংখ্যা বাড়িতে লাগিল ও সঙ্গে সঙ্গে অধ্যাপকের সংখ্যাও বাড়াইতে হইল। হিসাবপত্র রাখার জন্য একজন লোকের দরকার হইল। ডাক্তার কালীপ্রসন্ন লাহিড়ী হিসাবপত্র রাখিতেন, গুরুদেব স্বয়ং হিসাবপত্র পরীক্ষা করিতেন। বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার অব্যবহিত পরে আদিকুটিরের এবং রান্নাঘরের নির্মাণ আরম্ভ হইল। ডাক্তার কালীপ্রসন্ন বাবু ও রায়পুরের রবীন্দ্রনাথ সিংহ মহাশয় তাহার তত্ত্বাবধান করিতেন। সিংহ মহাশয় ভয়ানক রাশভারি লোক ছিলেন। ঘরের জন্য মাটি লওয়া হইতে লাগিল এখানকার দুই ক্যাবিনের মাঝে যে জামগাছটি আছে, তাহার তলা হইতে। ইহাতে সেখানে একটা প্রকাণ্ড গর্ত হইয়া গিয়াছিল। বর্ষাকালে এবং এমনকি শীত-কালেরও কিছুদিন পর্যন্ত সেখানে জল জমা থাকিত। ছেলেরা তাহাকে নাম দিয়াছিল 'কচ্ছপ-পুকুর'। বোধ করি হঠাৎ কোনো একদিন একটি কচ্ছপশাবক ইহাতে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিল বলিয়াই এই নামটি। এখন কচ্ছপ-পুকুরের নামগন্ধ নাই। প্রায় চারি-পাঁচ বৎসর পরে যখন শ্রীযুক্ত বঙ্কিমচন্দ্র রায় মহাশয় আশ্রমে শিক্ষক হইয়া আসেন, তখন তিনিই ছেলেদের লইয়াই সেই পুষ্করিণী ভরাট করিয়াছিলেন।

বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার বৎসরখানেকের মধ্যে আশ্রমের অনেক পরিবর্তন হইয়া গেল। উপাধ্যায় মহাশয় ও রেবাচাঁদ যাঁহারা বিদ্যালয়ের পত্তনের সহায় ছিলেন, তাঁহারা চলিয়া গেলেন। নূতন আসিলেন চন্দননগরের শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য, হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, সুবোধচন্দ্র মজুমদার

এবং কুঞ্জলাল ঘোষ। ঘোষ মহাশয় বিদ্যালয়ের সাধারণ কার্যাধ্যক্ষ হইলেন। আমরা এখন নূতন রান্নাঘরে আহার করি, আদি কুটিরে ছেলেদের সঙ্গে বাস করি। বোধহয় এই সময় হইতে যাহাকে বলে 'constitution' তাহারই সূত্রপাত হইল। গুরুদেব আমাকে ও মনোরঞ্জনবাবুকে আদেশ দিলেন, কুঞ্জবাবুর হিসাবের খাতা আমাদিগকে প্রতিদিন পরীক্ষা করিয়া সহি দিতে হইবে।

এখন অধ্যাপক এবং কর্মচারীদের যেমন চায়ের গোষ্ঠী আছে, আশ্রমের প্রথম বৎসর হইতে আমাদেরও সেইরকম চা-পান গোষ্ঠী ছিল। বিকালে চায়ের সভাটি জমিত ভালো। গুরুদেব প্রায়ই সেই সভায় উপস্থিত থাকিয়া সকলের সহিত গল্প করিতেন। আমরা সকলেই প্রাণ খুলিয়া হাসিতামাশা করিতাম। সুবোধবাবু ছিলেন এই সভার নেতা। সর্বদা একত্র অবস্থানে, একত্র আমোদ-প্রমোদে, একযোগে কাজকর্ম করায় অধ্যাপকদিগের পরস্পরের সঙ্গে যে হৃদয়ের যোগ হইয়াছিল, এমনটি আর দেখি নাই।

তখনকার উৎসবগুলিও অনুপম ছিল। বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার পরে দুই-তিন বৎসর ১লা বৈশাখে যে-উৎসব হইত, তাহার কথা আজো ভুলি নাই। প্রথম বৎসরের উৎসবে রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী, হীরেন্দ্রনাথ দত্ত মহাশয় প্রভৃতি অনেক অতিথি আসিয়াছিলেন। শ্রদ্ধাস্পদ মোহিতচন্দ্র সেন বোধ করি সেই উৎসবেই আশ্রমে প্রথম আসিয়াছিলেন। বেশ মনে পড়ে লাইব্রেরির মাঝের বড় ঘরটিতে সকলে বসিয়া গল্প করিতেছিলেন এবং পাশের ঘরে জলযোগের আয়োজন হইতেছিল। গুরুদেব "আমারে কর তোমার বীণা" গানটি গাহিলেন ; সকলে অবাক হইয়া শুনিতে লাগিলেন। তার পরে পশ্চিমে মেঘ করিয়া কালবৈশাখীর ঝড় আসিল। মোহিতবাবু এবং আরো অনেকে ঘর ছাড়িয়া সম্মুখের মাঠে দাঁড়াইলেন। মোহিতবাবু ঝড়ের প্রতিকূলে যে প্রকারে দৌড়াইতে-ছিলেন, তাহার ছবি এখনো চোখে ভাসিতেছে। তিনি যেন ছিলেন

উৎসাহের জীবন্ত মূর্তি। বর্ষশেষের রাত্রিতে আমরা কেহই ঘুমাইতাম না। কেহ ঘুমাইতে চেষ্টা করিলে তাহাকে জাগাইয়া রাখিতাম। সমস্ত রাত্রি মাঠে ঘুরিয়া গোলমালে কাটানো যাইত। তার পরে যখন রাত্রি চারিটার সময়ে মন্দির হইতে মৃদঙ্গের শব্দ এবং রাধিকা গোস্বামী মহাশয়ের প্রভাতী রাগিণীর স্বর কানে আসিত, তখন মন্দিরে গিয়া উপস্থিত হইতাম। তারপরে সূর্যোদয়ের সঙ্গে আরম্ভ হইত গুরুদেবের উপদেশ। সেইসকল উপদেশ এখন বঙ্গভাষার পরম সম্পদ্ হইয়া রহিয়াছে। তাহার পরিচয় দেওয়া নিষ্প্রয়োজন। এখন ভাবি, আমাদের তখনকার সেই উৎসাহ, সেই উদ্যম কোথায় গেল।

সে-সময়কার ৭ই পৌষের উৎসবগুলিও সুন্দর ছিল। কলিকাতা হইতে অনেক বিশিষ্ট অতিথি আসিতেন। মনে পড়ে একবারের ৭ই পৌষে শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়, উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী এবং কবি রজনীকান্ত সেন মহাশয় আসিয়াছিলেন। 'কান্তকবি'কে সেই প্রথমে দেখিলাম এবং তাঁহার গান শুনিলাম। একটা হারমোনিয়াম কাছে পাইলে তিনি অবিরাম গান করিতেন। গানে তাঁহার ক্লান্তি দেখি নাই। বোধহয় সেইবারকার ৭ই পৌষে আশ্রম বালকেরা 'বিসর্জন' নাটকখানি অভিনয় করিয়াছিল। ইহাই আশ্রমের ইতিহাসে প্রথম অভিনয়। ইহাতে অপর্ণার ভূমিকা ছিল না। শ্রীমান সন্তোষচন্দ্র মজুমদার হইয়াছিলেন গোবিন্দমাণিক্য, জয়সিংহ হইয়াছিলেন শ্রীমান রথীন্দ্রনাথ, এবং রঘুপতি ছিলেন দিনুবাবু। শ্রীযুক্ত অক্ষয় মৈত্রেয় মহাশয় স্টেজ নির্মাণে সাহায্য করিয়াছিলেন। শ্রীমান নয়নমোহন চট্টোপাধ্যায় "দুই কানে বাসা করিয়াছে দুই টিয়াপাখি" বলিয়া যে সুন্দর অভিনয় করিয়াছিলেন, তাহা আজো মনে আছে। অভিনয়ে এমন উৎসাহ আর দেখি নাই। আমরা কয়েকজন সেই পৌষ মাসের শীতে স্টেজেই রাত্রি কাটাইয়াছিলাম। লাইব্রেরির উত্তরে এবং রান্নাঘরের

পশ্চিমে যে একটি বড় ঘর ছিল, সেই ঘরে অভিনয় হইয়াছিল।

যতদূর মনে পড়ে বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার দুই বৎসর পরে সতীশচন্দ্র রায় মহাশয় আশ্রমের কাজে যোগদান করেন। অজিতকুমার চক্রবর্তী মহাশয় তাঁহার বন্ধু ছিলেন। সেই সূত্রে অজিতবাবু প্রায়ই আশ্রমে আসিতেন। অজিতবাবুর তখন পাঠ্যদশা; সতীশবাবুর মৃত্যুর পরে বি. এ. পাশ করিয়া তিনি আশ্রমের কাজে যোগদান করেন। সতীশবাবুর আগমনে বিদ্যালয়ের হাওয়া ফিরিয়া গিয়াছিল। এমন সাহিত্যরসিক উৎসাহী যুবক আর দেখি নাই। নিত্য নূতন রচনায় এবং কবিতা পাঠে তখনকার ছাত্রদিগের ভিতরে তিনি সাহিত্যপ্রীতি জাগাইয়া তুলিয়াছিলেন। এমন আপনভোলা লোক আর দেখা যায় না। রাত্রে একসঙ্গে আহারে বসিতাম, পাঁচমিনিটের মধ্যে আহার শেষ করিয়া সতীশবাবু উঠিয়া মাঠে বাহির হইয়া পড়িতেন। কত অনিদ্র রজনী যে তিনি একা এবং কখনো অজিতবাবুর সঙ্গে মাঠে মাঠে ঘুরিয়া কাটাইয়া দিতেন, তাহা স্পষ্ট মনে পড়ে। প্রকৃতির সঙ্গে পরিচয়ের অতি সামান্য উপলক্ষ্যও তিনি ত্যাগ করিতেন না। সতীশবাবুর আয়োজনে একবার Midsummer Night's Dream-এর যে অভিনয় হইয়াছিল, তাহা সুস্পষ্ট মনে পড়ে। ইহার রিহার্সাল হইত উত্তরায়ণের পশ্চিমের খোয়াইয়ের ভিতরে। রবীন্দ্রনাথ, দিনেন্দ্রনাথ এবং সন্তোষচন্দ্র এই অভিনয়ে যোগদান করিয়াছিলেন। আমারো একটা ভূমিকা ছিল। শেক্সপিয়ারের লেখা কবিতা মুখস্থ করিয়া অভিনয় করিতে হইবে। খুব মুখস্থ করিলাম। কিন্তু রঙ্গমঞ্চে দাঁড়াইয়া দেখি, সকল শ্রম পণ্ড হইয়াছে। যাহা মুখস্থ করিয়াছিলাম, তাহার একছত্রও মনে নাই। কিন্তু অভিনয় তো করিতে হইবে—কাজেই যাহা মুখে আসিল, তাহা বলিয়া অভিনয় শেষ করিলাম। শ্রোতৃবর্গ এই নূতন অভিনয় দেখিয়া অবাক। স্বর্গীয় রমণীমোহন চট্টোপাধ্যায় মহাশয়

এই সময়ে মাঝে মাঝে শান্তিনিকেতনে আসিয়া বিদ্যালয়ের কাজকর্ম দেখিতেন। দর্শকদের মধ্যে তিনি উপস্থিত ছিলেন। আমার অভিনয়পটুতা দেখিয়া তিনি খুব সাধুবাদ করিয়াছিলেন মনে আছে।

১৯০৪ সালের মাঘ মাসে সতীশবাবু এই আশ্রমেই বসন্তরোগে মারা যান। তখন বিদ্যালয় বন্ধ ছিল। আমরা চিঠি পাইলাম, বিদ্যালয় শিলাইদহে যাইবে। সকলেই শিলাইদহে উপস্থিত হইলাম। বৈশাখ পর্যন্ত বিদ্যালয়ের কাজ শিলাইদহেই হইয়াছিল। ইহার পূর্বে শ্রীযুত ভূপেন্দ্রনাথ সান্ন্যাল এবং রাজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় বিদ্যালয়ের কার্যে যোগ দিয়াছিলেন। বোধ করি এই সময়েই অধ্যাপক মোহিতচন্দ্র সেন মহাশয় এবং নগেন্দ্রনাথ আইচ শিলাইদহে আসিয়া বিদ্যালয়ের কার্যে যুক্ত হইয়াছিলেন। মোহিতবাবু গুরুদেবের সহিত পরামর্শ করিয়া বিদ্যালয়ের অধ্যাপনা প্রভৃতির পাকাপাকি ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। শিলাইদহেই ইহার সূত্রপাত হয়।

বিদ্যালয় শান্তিনিকেতনে ফিরিয়া আসিলে ছাত্রসংখ্যা বাড়িতে আরম্ভ করিয়াছিল মনে পড়ে। মোহিতবাবু এই সময়ে অসুস্থ হইয়া পড়িয়াছিলেন। শীঘ্রই তাঁহাকে আশ্রম ত্যাগ করিতে হইয়াছিল। তখন গুরুদেবের শরীর ভালো ছিল না। অথচ দায়িত্ব বাড়িয়াই চলিয়াছিল। আবার উপর্যুপরি পারিবারিক বিপদ আসিতে লাগিল। এই সংকটকালে কিন্তু তাঁহাকে আমরা একটুও নিরুৎসাহ হইতে দেখি নাই। অক্ষম আমরা দীর্ঘকাল কাছে থাকিয়াও তাঁহার আদর্শ অনুসারে ছেলেদের গড়িয়া তুলিতে পারিতাম না; বরং আমরাই মাঝে মাঝে বিদ্রোহী হইয়া গোলযোগ বাধাইয়া তুলিতাম। এখন সে সব কথা মনে করিলে লজ্জায় মাথা নত হয়। গুরুদেব নিজেই ছেলেদের সহিত মিশিয়া ছেলেদের মধ্যে থাকিয়া তাঁহার আদর্শকে ফুটাইয়া তুলিতে প্রাণপণ পরিশ্রম করিতেন। এই সময়ে আচার্য জগদীশচন্দ্র মাঝে

মাঝে আশ্রমে আসিতেন এবং তাঁহার গবেষণা-সম্বন্ধীয় পরীক্ষাদি আমাদের দেখাইতেন। অনেকবার গুরুদেব নিজে আয়োজন করিয়া রায়পুর প্রভৃতি স্থানে ছেলেদের লইয়া পিক্‌নিক্ করিতে গিয়াছেন। মনে পড়ে, একবার গুরুদেব এবং আচার্য জগদীশচন্দ্র ছেলেদের লইয়া হাঁটিয়া রায়পুর পর্যন্ত গিয়াছিলেন, এবং আহারান্তে হাঁটিয়া আশ্রমে ফিরিয়াছিলেন। ছেলেদের তখন যতগুলি বাসগৃহ ছিল, গুরুদেবকে পর্যায়ক্রমে প্রত্যেক বাসগৃহে কিছুদিন করিয়া থাকিতে দেখিয়াছি।

ইহার অনেকদিন পরের একটি ঘটনার কথা মনে পড়িল। তখন গুরুদেব ছেলেদের সঙ্গে লাইব্রেরির উপরকার দোতলা খড়ের ঘরে থাকিতেন। সেই ঘরের ছেলেরা বড় উচ্ছৃঙ্খল হইয়া পড়িয়াছিল। তাই তাঁহাকে কিছুকাল সেখানে থাকিতে হইয়াছিল। হয়তো ছেলেদের মনোরঞ্জন করিয়া সংযত রাখিবার জন্য ঐ ঘরে বসিয়া তিনি একখানি নাটক লেখা আরম্ভ করিয়া দিলেন। দিনে দিনে নূতন নূতন সুরে গান রচনা হইতে লাগিল। সন্ধ্যার পরে সেখানে বসিয়াই ছেলেদের সেইসব গান শিখাইতে লাগিলেন। আনন্দের আর সীমা রহিল না। আশ্রমে যে একটা থম্‌থমে ভাব ছিল, তাহা কাটিয়া গেল। ইহাই সেই সুপ্রসিদ্ধ 'শারদোৎসব' নাটক। এই নাটকখানি যেদিন আশ্রমবাসী সকলকে ডাকিয়া আগাগোড়া শুনানো হয়, তাহাও মনে পড়ে। তখন সবে নাট্যঘরের মাঝের অংশটা নির্মিত হইয়াছে। গুরুদেব সেই ঘরে সভা করিয়া একদিন সন্ধ্যায় 'শারদোৎসব' পড়িয়া শুনাইলেন। ইহার পরেও লক্ষ্য করিয়াছি, কোনো কারণে আশ্রমে যখন ক্ষোভ দেখা দিয়াছে, তখন অভিনয়াদির আয়োজনে সবই পরিষ্কার হইয়া গিয়াছে। আমাদের আশ্রমে এখন যে ঋতু-উৎসবের অনুষ্ঠান হয়, তাহার সার্থকতা কম নয়।

আশ্রমের প্রথম-জীবনে এখনকার মতো সাহিত্যসভা এবং পত্রিকাদি

প্রকাশের ব্যবস্থা ছিল না বটে, কিন্তু সাহিত্যের আলোচনা যথেষ্ট ছিল। মোহিতবাবু আসিয়া ছাত্র ও অধ্যাপকদের মধ্যে 'সাহিত্যসভা'র প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। মনে পড়ে আমি কয়েকটি প্রবন্ধ এই সভায় পড়িয়াছিলাম। গুরুদেব এই সভায় আসিয়া বসিতেন। সতীশবাবু যখন আশ্রমে ছিলেন, তখন তিনি সাহিত্যের আসরখানিকে রচনাপাঠে মশ্‌গুল রাখিতেন। গুরুদেব যে সকল প্রবন্ধাদি রচনা করিতেন তাহার প্রথম প্রসাদ এখনকারই মতো আমাদেরই ভাগ্যে জুটিত। তার পরে কিছুকাল ধরিয়া অতি প্রত্যুষে তিনি মন্দিরে নিয়মিতভাবে যে সকল উপদেশ দিতেন, তাহাও তখন আশ্রমে সাহিত্যক্ষেত্র রচনার সহায় হইয়াছিল। সেই অমূল্য উপদেশাবলীর অধিকাংশই 'শান্তিনিকেতন' নামক পুস্তিকার কয়েক খণ্ডে রহিয়াছে। তারপরে পূজনীয় বড়বাবু মহাশয় মাঝে মাঝে আসিয়া অধ্যাপকদিগকে লইয়া বৈঠক করিতেন। তাহাতে সাহিত্য ও দর্শন সম্বন্ধে যে সকল আলোচনা হইত, তাহা অধ্যাপকদিগকে কম উপকৃত করে নাই। এই সময়ের একটি ঘটনার কথা মনে পড়িয়া গেল। তখন 'বেদান্তদর্শন' অথবা 'কাণ্ট' লইয়া প্রত্যেক সন্ধ্যায় দিনের পর দিন আলোচনা চলিতেছিল। সকলে তন্ময় হইয়া শুনিতেন। আমার কিন্তু শুনিতে শুনিতে ঘুম পাইত। ঘুম আর রাখা যায় না ; তাই ঘটি হাতে করিয়া সভা ত্যাগ করিয়া যাইতাম। বড়বাবু কয়েকদিন ইহা লক্ষ্য করিয়া একদিন বলিলেন— "জগদানন্দ আমাকে দেখলেই ঘটি হাতে করে বার হয়ে পড়েন। তাঁর হল কী? আচ্ছা তাঁকে ছুটি দেওয়া গেল।" গুরুদেবের কাছে যেমন অনেক নূতন কবি ও লেখক রচনা সংশোধন করাইবার জন্য উপস্থিত হন, আমরাও একসময়ে আমাদের নিজের রচনা সংশোধন করাইবার জন্য তাঁহার নিকটে যাইতাম। ইহাতে তাঁহাকে একটু বিরক্ত হইতে দেখি নাই ; কোন্ বিষয়ে কি-রকমে লিখিলে ভালো হইবে, সর্বদাই সে-সম্বন্ধে উপদেশ পাইয়াছি।

আমার আগেকার বৈজ্ঞানিক ভাষা ভয়ানক জটিল ছিল। সহজ ভাষায় বৈজ্ঞানিক বিষয় লিখিবার উপদেশ তিনি আমাকে বারবার দিয়াছেন। কেবল ইহাই নয়, আমার দুই-একখানি বইয়ের প্রুফ পর্যন্ত তিনি নিজে দেখিয়া সংশোধন করিয়াছেন। কেবল আমিই যে এই অনুগ্রহ পাইয়াছি, তাহা নয়। অধ্যাপক ও ছাত্রদের মধ্যে যাঁহারা একটু আধটু লিখিতে পারিতেন, তাঁহাদিগের উপরে নানা বিষয়ের লেখার ভার দিয়া, তিনি তাহা আদায় করিয়া লইতেছেন এবং সংশোধন করিয়া দিতেছেন ইহাও অনেক দেখিয়াছি। ইহার ফলে এক সময়ে আশ্রমের অধ্যাপক ও ছাত্রদের ভিতরে সাহিত্যচর্চা খুব বাড়িয়াছিল। সেই সময়ের কয়েকটি ছাত্র এবং অধ্যাপক এখন সুলেখক বলিয়া খ্যাতিও অর্জন করিয়াছেন।

১৩৩৩

জগদানন্দ রায়-রচিত গ্রন্থসূচী

শ্রীপার্থ বসু

প্রকৃতি-পরিচয় ॥ ১৩১৮

বিজ্ঞানাচার্য্য জগদীশচন্দ্রের আবিষ্কার ॥ ১৩১৯

বৈজ্ঞানিকী ॥ ১৩২০

প্রাকৃতিকী ॥ ১৯১৪

গ্রহ-নক্ষত্র ॥ ১৯১৫

পোকামাকড় ॥ ১৩২৬

বিজ্ঞানের গল্প ॥ ১৯২০

গাছপালা ॥ ১৯২১

মাছ, ব্যাঙ্‌, সাপ ॥ ১৯২৩

পাখী ॥ ১৩৩১

শব্দ ॥ ১৩৩১

বাংলার পাখী ॥ ১৯২৪

আলো ॥ ১৩৩৩

তাপ ॥ ১৩৩৫

চুম্বক ॥ ১৩৩৫

স্থির-বিদ্যুৎ ॥ ১৯২৮

চল-বিদ্যুৎ ॥ ১৩৩৬

নক্ষত্র-চেনা ॥ ১৯৩১

প্রকৃতি-পরিচয় ঢাকা অতুল লাইব্রেরি কর্তৃক প্রকাশিত, অন্য বইগুলির প্রকাশক ইণ্ডিয়ান প্রেস, এলাহাবাদ / ইণ্ডিয়ান পাবলিশিং হাউস, কলিকাতা।

এ ছাড়া জগদানন্দ রায় আর্য্য-কাহিনী, ছুটির বই, পর্য্যবেক্ষণ শিক্ষা প্রভৃতি অনেকগুলি পাঠ্যগ্রন্থও রচনা করেছিলেন।

প্রাক্তন ছাত্র ও কর্মীদের শ্রদ্ধাঞ্জলি শ্রীঅনাথনাথ দাস

প্রবন্ধ

মনোরঞ্জন চৌধুরী, "অধ্যাপক শ্রীযুক্ত জগদানন্দ রায়", সুপ্রভাত, মাঘ ১৩১৮

শ্রীনির্মলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, "স্বর্গীয় জগদানন্দ রায়", বিচিত্রা, আশ্বিন ১৩৪০

শ্রীহীরেন্দ্রনাথ দত্ত, "জগদানন্দ রায়", দেশ, সাহিত্য-সংখ্যা, ১৩৭৩

শ্রীঅমিয়কুমার সেন, "জগদানন্দ রায়", ভারত-কোষ, তৃতীয় খণ্ড, ১৩৭৪

শ্রীচিত্তপ্রিয় মুখোপাধ্যায়, "শিক্ষাব্রতী জগদানন্দ রায়", যুগান্তর, ৩ আশ্বিন ১৩৭৬

শ্রীকমলাকান্ত শর্মা [শ্রীপ্রমথনাথ বিশী], "জগদানন্দ রায়", আনন্দবাজার পত্রিকা, ৭ আশ্বিন ১৩৭৬

শ্রীহীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, "জগদানন্দ রায়", কথাসাহিত্য, আশ্বিন ১৩৭৬

S. K. M. [Sisirkumar Mitra], "Jagadananda Roy", *Visva-Bharati News*, July 1933

Sudhiranjan Das, "Master Mashai Jagadananda Roy", *Visva-Bharati News*, September 1969

Nityanandabinode Goswami, "Jagadananda Roy", *Visva-Bharati News*, September 1969

Niranjan Sarkar, "Jagadananda Roy", *Visva-Bharati News*, September 1969

জগদানন্দ-প্রসঙ্গ-সংবলিত গ্রন্থ

শ্রীপ্রমথনাথ বিশী, রবীন্দ্রনাথ ও শান্তিনিকেতন, ১৩৫১

Rathindranath Tagore, *On the Edges of Time*, 1958

শ্রীসুধীরঞ্জন দাস, আমাদের শান্তিনিকেতন, ১৩৬৬

স্বীকৃতি

বর্তমান সংকলনের প্রথম রচনা, জগদানন্দের পরলোকগমনের পর শ্রাদ্ধবাসরে শান্তিনিকেতন মন্দিরে রবীন্দ্রনাথের ভাষণের একাংশ, প্রবাসী ভাদ্র ১৩৪০ থেকে পুনর্মুদ্রিত। দ্বিতীয় রচনা জগদানন্দের জন্মশতবর্ষপূর্তি স্মরণে ২০ সেপ্টেম্বর ১৯৬৯ আকাশবাণীর কলিকাতা কেন্দ্রে পঠিত ও আকাশবাণীর সৌজন্যে মুদ্রিত। ষষ্ঠ রচনা, জগদানন্দ রায় লিখিত শান্তিনিকেতনের প্রথম যুগের স্মৃতি, শান্তিনিকেতন পত্র জ্যৈষ্ঠ ১৩৩৩ সংখ্যা থেকে গৃহীত। অন্যান্য রচনা এই সংকলনের জন্য নবলিখিত। জগদানন্দের উদ্দেশে শান্তিনিকেতন প্রাক্তন ছাত্র ও কর্মীদের রচিত এবং বিভিন্ন পত্রিকায় ও গ্রন্থে মুদ্রিত শ্রদ্ধাঞ্জলির একটি সূচী এই পুস্তকে সন্নিবিষ্ট হয়েছে।

বর্তমান পুস্তিকা সংকলনের ভার শান্তিনিকেতন পুস্তক-প্রকাশ-সমিতি শ্রীপুলিনবিহারী সেন ও শ্রীনিরঞ্জন সরকারকে অর্পণ করেন। মুদ্রণব্যবস্থায় তাঁদের বিশেষ সহায়তা করেছেন শ্রীজগদিন্দ্র ভৌমিক ও শ্রীশুভেন্দুশেখর মুখোপাধ্যায়; শ্রীঅনাথনাথ দাসও নানাভাবে সহায়তা করেছেন।

এই পুস্তিকার প্রচ্ছদে জগদানন্দের যে প্রতিমূর্তির ছবি ব্যবহৃত হয়েছে তা শ্রীপ্রভাতমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়-গঠিত; মূর্তিটি শান্তিনিকেতন কলাভবনে রক্ষিত আছে। মূর্তির আলোকচিত্র তুলে দিয়েছেন শ্রী এস. কে. ডেভিড। মুখপাতে ব্যবহৃত আচার্য নন্দলাল বসু-অঙ্কিত চিত্র শ্রীবিশ্বরূপ বসুর সৌজন্যে মুদ্রিত। জগদানন্দের আলোকচিত্র শ্রীহিমাংশুলাল সরকার কর্তৃক গৃহীত ও তাঁর সৌজন্যে মুদ্রিত। জগদানন্দ রায়ের পাণ্ডুলিপি শ্রীঅনুপানন্দ ভট্টাচার্যের সৌজন্যে প্রাপ্ত।

প্রকাশক
শ্রীবিদ্যুৎরঞ্জন বসু
শান্তিনিকেতন পুস্তক-প্রকাশ-সমিতি, শান্তিনিকেতন

মুদ্রাকর
শ্রীপীযূষকান্তি দাশগুপ্ত
শান্তিনিকেতন প্রেস, শান্তিনিকেতন

মূল্য এক টাকা

চিত্রসূচী। ছত্র ৫। ১৩৩০ স্থলে ১৯৩০ হইবে।

পৃ ৫। ছত্র ৩। ৮ই পৌষ স্থলে ৭ই পৌষ হইবে। শান্তিনিকেতন ব্রহ্মবিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা ৭ই পৌষ, বিশ্বভারতীর প্রতিষ্ঠা ৮ই পৌষ।

পৃ ৬২। ছত্র ১৮। রবীন্দ্রনাথ স্থলে রথীন্দ্রনাথ হইবে।

বিশ্বভারতী
শান্তিনিকেতন